চুনি হ'ল রাঙা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৬৮

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়
মুদ্রাকর
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশব সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

উৎসর্গ

আদরের কুটুম্বিনী

কল্যাণীয়া জয়শ্রী পাল

হাসিরাণীর করকমলে—

॥ প্রারম্ভ ॥

বছর আঠারো আগের কথা। ১৯৬০-৬১ সাল হবে সেটা। হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় বহু সাধু এসে পৌঁচেছেন, এপারে-ওপারে যতটা পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছয়—সাধু, সাধুসঙ্গপ্রয়াসী ও পুণ্যলোভাতুর মানুষ এক বিশাল সমুদ্র সৃষ্টি করেছে।

হরিদ্বার কনখলে বহু আখড়া বা আশ্রম আছে, সেখানে যতদূর সম্ভব আগন্তুক সাধু ও তাঁদের তল্পিবাহকদের স্থান দেওয়া হয়েছে। কিছু উপার্জন-প্রয়াসী সাধু কনখলের প্রধান রাস্তার দু'ধারে বাগানে বাগিচায় আস্তানা ফেলেছেন। কিন্তু বেশির ভাগ অভিজাত সাধু যাঁরা, তাঁরা আছেন গঙ্গার ওপারে নীলধারার বিস্তীর্ণ চড়ায়। তাঁবু ফেলে অথবা কাশফুলের ডাঁটা ঘাস ইত্যাদি দিয়ে তৈরি অস্থায়ী ঘর বানিয়ে।

হ্যাঁ—চমকে যাবেন না, সাধুদের মধ্যেও অভিজাত ও অন্ত্যজ শ্রেণী আছেন বৈকি, অন্ততঃ আমাদের হিসেবে। যিনি যত উচ্চকোটির সাধক তিনি তত অভিজাত, তাঁরা লোকালয়ে আসেন কদাচিৎ। তার পরের স্তককে মানে মণ্ডলেশ্বর মোহান্ত—এঁদের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে ধরা যেতে পারে; তারপর সাধারণ, 'পেটটালা' অর্থাৎ যারা অন্য কাজ না পেয়ে বা আলস্যে দিন গুজরান করার সহজ পন্থা হিসেবে এই বৃত্তি নিয়েছে। তারপর অন্ত্যজ শ্রেণী, পয়সার লোভে যারা এই 'ভেক্' নেয়—এর ছদ্মাবরণে থেকে চুরি-চামারি করতেও যাদের আপত্তি নেই, বরং উৎসাহ আছে।

শ্রীশ্রীবাবা বৈরাগ্যনাথ অবধূত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সাধক ছিলেন, অর্থাৎ নামকরা একজন 'মণ্ডলেশ্বর'। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি, সম্পদ, শিষ্য ভক্ত প্রায় সীমা-সংখ্যাহীন। কিন্তু হঠাৎই বছর কতক আগে একদিন 'গদি' ঐশ্বর্য সব ছেড়ে ভক্তদের অবলম্বনহীন ক'রে অপর এক

পরীক্ষিত খাঁটি সাধক চেলাকে গদিতে বসিয়ে হিমালয়ের এক বিজন প্রদেশে চলে গেলেন প্রায় এক বস্ত্রে। গেলেন নাকি এবার সত্যকার তপস্যার জন্য। তবে কি এতদিন উনি কোন তপস্যা করেন নি? এ প্রশ্নও অনেক ভক্তই করেছিল বৈকি। তার উত্তরে উনি বলেছিলেন, 'না, এইবারই শুরু করব ভাবছি। তাও সঙ্কল্পমাত্র, কতদূর কি হবে তা জানি না। এত দিন তো পুতুল খেলা নিয়ে মেতে ছিলাম, সাধু-সাধু খেলা করেছি শুধু। পরমাত্মার লীলা তো! ভারী কপট মানুষটা, পাছে চট ক'রে কেউ কাছে এগিয়ে যায়, আস্তানায় ঢুকে পড়ে, তাই চারিদিকে নানান ফাঁদ পেতে রেখেছে। ওঁর বাড়ি পৌঁছবার আগেই পথে পথে কত প্রাসাদ, কত বাড়ি, কত না সুখ আর আরামের আয়োজন। কাজ এক গুণা তো তার বকশিশ আট গুণা। বাচ্চাদের মতো যে ওতেই ভুলল, সে ভুলেই রইল। যখন ভুল ভাঙে—কারও বা কখনই ভাঙে না—তখন দেখে আসল দেশে পৌঁছবার খেয়া ছেড়ে গেছে—ওপারে পৌঁছানো আর তার হ'লই না, এপারেই পড়ে রইল। আর তখনই বোঝে এপারে সবই ফাঁকি, যে সুখের লোভে পথে এত দেরি করল সে সুখ নয়, ফাঁকি আর ফাঁকা! মানে তার একূল-ওকূল দু'কূলই গেল। না বাবা-সকল, আমার ঘুম ভেঙেছে, আমি পুতুল খেলায় আর ভুলে থাকতে নারাজ। যদি এই সবই করব, টাকা-পয়সা, বাড়ি-ঘর, জমি-জায়গা, মামলা-মোকদ্দমা, তাহলে ঘর ছেড়ে এলুম কেন? এত মাথা ঘামালে সেখানে বসেই বিস্তর পয়সা কামাতে পারতুম!'

এসব অনেকদিনের কথা। বাবা বৈরাগ্যনাথ সব ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে চলে গেছেন, সে অন্ততঃ এই কুম্ভের বিশ-পঁচিশ বছর আগের কথা। হিসেব মতো তাঁর বয়স একশো ছাড়িয়ে যাবার কথা। তিনি যাঁকে গদি দিয়ে গিছলেন, সে মণ্ডলেশ্বর ব্রহ্মলাভ করেছেন, অন্য এক প্রবীণ সাধু আখড়ায় মোহান্ত হয়ে বসেছেন, যদিচ এখনও মণ্ডলেশ্বর হতে পারেন নি।

এই এতকাল পরে সবাই যখন ভাবতে শুরু করেছে, বাবা বৈরাগ্য-নাথ কবেই নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছেন, উপোস ক'রে মরেছেন, অথবা বাঘ ভালুকের হাতে, তখন অকস্মাৎই এই কুম্ভের সূচনায় শ্রীপঞ্চমীর স্নানের দিন ভক্তসমাজে আবির্ভূত হলেন আবার। শুধু তাই নয়, দেখা গেল তাঁর চেহারার এতটুকু পরিবর্তন হয় নি কোথাও। তিনি আশির কোঠায় পৌঁছে যখন একবস্ত্রে কপর্দকশূন্য অবস্থায় পায়ে হেঁটে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন তখনও তাঁকে ষাটের বেশি দেখাত না, এখনও দেখায় না। একটাও দাঁত পড়ে নি, চামড়ায় কোন নতুন কুঞ্চন দেখা দেয় নি। শুধু লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যাবে যে, তাও যে ক'জন তাঁর তখনকার শিষ্য-সন্ন্যাসী বা ভক্ত দীর্ঘদিন দেখেছিলেন তাঁরাই বলতে পারবেন—জটাটা হয়ত কিছু দীর্ঘতর হয়েছে, তাঁর কোলের অর্থাৎ মাথার কাছের অংশটা শুভ্রতর এবং রঙটা আগের চেয়ে ঢের ফরসা। বোধহয় বরফের মধ্যে বাস করার জন্যই। হ্যাঁ, বরফের দেশেই থাকতেন। বছর বারো আগে এক দুঃসাহসী তীর্থপদযাত্রী, ওঁর অনুরাগী গৃহস্থ ভক্তের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় নীলকণ্ঠ শৃঙ্গের পাদদেশে, এক স্বাভাবিক গুহায় বাস করছেন। ধুনি নেই, আগুন নেই, গায়ে একটি মাত্র কম্বল, সেটাই বহির্বাসের কাজ করছে—বাস করছেন একটি স্বল্পপরিসর স্বাভাবিক গুহায়। কী খান, সেখানে কে খাদ্য দিয়ে যায়—তার উত্তরে খুব হা-হা ক'রে হেসে বলেছেন, 'আরে বেটা, যার ঘরে এসেছি, খাওয়াবার দায় তো তারই। আর না খাইয়ে যদি বাঁচিয়ে রাখেন সে তো আরও আচ্ছা।'

এহেন বাবার এই অচিন্তিত আকস্মিক আবির্ভাবে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হবে সে তো জানা কথাই। যে অল্প দু' একজন পুরনো লোক এখনও বেঁচে আছেন তাঁরা এসে পায়ে আছড়ে পড়লেন। বাকী যাঁরা তাঁর কথা এই গত ক'বছরে বিস্তর শুনেছেন—কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন বাবা বৈরাগ্যনাথ—পওহারী অর্থাৎ পবন আহারী বাবা, যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছেন—যিনি জরা-মৃত্যুকে অনায়াসে জয়

করেছেন ইত্যাদি—তাঁরাও সেই অর্ধেক-মানব অর্ধেক-ঈশ্বর ব্যক্তিকে দেখে কৃতার্থ অভিভূত হয়ে গেলেন। অনেকে বিনা কারণে শুধু মানসিক আবেগে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলেন।

বর্তমান মোহান্ত মহারাজের গোড়াতে মুখ শুকিয়েছিল, তবু ভদ্রতা ক'রে তিনি এসে হাতজোড় ক'রেই বলেছিলেন, 'এবার আপনার গদি আপনি নিন বাবা, আমাকে ছুটি দিন।' তার উত্তরে তাঁকে আশ্বস্ত ও চমকিত ক'রে বাবা হেসে বলেছিলেন, 'দূর পাগল! এত ছোট গদির লোভে ছুটে আসব যদি তো ছেড়ে গেলুম কেন। না, আমি আরও উম্‌দা গদি পেয়েছি। আমি এসেছি ক'টা দিনের জন্যে—স্নান করতে আর যদি তেমন কোন ভারী সাধুর দর্শন মিলে যায় এই আশায়। আরও একটা কারণ আছে—তবে সে-কথা থাক।'

বাবা এঁদের বহু অনুনয়-বিনয়েও আখড়ায় থাকতে রাজী হলেন না। বললেন, 'চার দেওয়ালের মধ্যে থাকা বহুদিন অভ্যাস নেই, ও আর পারব না। ওপারে চড়ায় থাকব।' ভক্তরা সেই শুনে গিয়ে যথাসাধ্য দ্রুত একটা পর্ণকুটির ক'রে দিয়েছে বটে কিন্তু বাবা তাতে থাকেন কদাচিৎ। বেশির ভাগ সময়ই দিন এবং রাত—বাইরে খোলা জায়গায় বসে থাকেন। আহার করেন দিনান্তে একটি ফল কিংবা একটু 'দহি', কোন কোন দিন কোন ভক্ত পীড়াপীড়ি করলে তার আনা একটু মিষ্টিও ভেঙে মুখে দেন—অর্থাৎ ধরাবাঁধা কোন নিয়মে বাঁধা পড়েন নি এখনও—তবে ঐটুকুতেই ওঁর চব্বিশ ঘণ্টার খাওয়া শেষ হয়ে যায়। একবার ছাড়া আর কিছু মুখে দেন না।

ভক্তদের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই, উনিও তাদের সকলের সঙ্গেই সহৃদয় ব্যবহার করছেন, কে বলবে যে এই লোকটিই সমস্ত মানবসমাজ পরিহার ক'রে একদা চলে গিছলেন, এক হিমারণ্যে তপস্যা করবেন বলে। কেউ কেউ এমন কথাও বলতে শুরু করেছেন যে, 'আসলে বাবা এতকাল একা থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, উনি মানুষের লোভেই এই কুম্ভে এসেছেন'। নিজের 'কুটিয়া' বা 'ঝোপড়া' যাই বলুন, তার সামনেই

বসে থাকেন বেশির ভাগ, এক-এক সময় দুপুরের দিকে হঠাৎ উঠে হন্-হন্ ক'রে হাঁটতে শুরু করেন—যেন এই বিরাট সাধুসঙ্গমে স্নান করবেন বলে। অর্থাৎ এই সময়টায় উনি সাধু দেখেই বেড়ান। কোথাও যে বসেন বা আলাপ করেন তা নয়, সাধুরা অধিকাংশই ধুনি জ্বালিয়ে বাইরে বসে থাকেন, তাঁদের দূর থেকে দেখে দেখে চলে যান। কোথাও—বিশেষ নাগাদের পাড়ায়—এক-আধবার থমকে দাঁড়ান হয়ত মধ্যে মধ্যে, চোখো-চোখি হলে 'শিব শিব' উচ্চারণ ক'রে নমস্কার জানান, তবে কারও আমন্ত্রণেই আসন গ্রহণ করেন না।

মোহান্ত বা মণ্ডলেশ্বরও এর মধ্যে কেউ কেউ এসেছেন এই আশ্চর্য বহুশ্রুত-খ্যাতি সাধুটিকে দর্শন করতে। তাঁরা বারবার সবিনয়ে মিনতি জানিয়েছেন তাঁদের আশ্রমে পায়ের ধুলো দিতে—কিন্তু বাবা সম্মত হন নি। মধুর বচনে ও মধুরতর হাস্যে নানা অজুহাতে সে প্রস্তাব এড়িয়ে গেছেন।

তাই হঠাৎই অমাবস্যার স্নানের আগের দিন উঠে নতুন তৈরি অস্থায়ী পুল পেরিয়ে হরিদ্বার শহরে আসতে ভক্ত ও পরিচিতদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। অনেকেই ছুটে এলেন, সংবাদ পেয়ে অনুগামীদের সংখ্যা বাড়তেই থাকল। কিন্তু উনি কোথাও দাঁড়ালেন না। 'বাজার দেখতে বেরিয়েছি, অনেকদিন পরে এ শহর দেখছি তো।' সংক্ষেপে এইটুকু বলেই হাঁটতে লাগলেন।

শ্রবণনাথ ঘাট, কুশাবর্ত ঘাটের ঐ রাস্তায় যাঁরা যাতায়াত করেছেন তাঁরাই জানেন, ঐ রাস্তা যেখানে 'হর কি প্যারী' ঘাটের প্রধান রাস্তাটায় এসে মিশেছে সেখানে একটি বড় খাবারের দোকান আছে। দোকানটা বহুদিনের, এখনও একই জায়গাতে আছে, এবং যথেষ্ট ভিড় হয়। একদল ভিক্ষার্থী সাধুও সকালে ভিড় ক'রে সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা যদি কেউ উত্তম পুরী কচুরি ভিক্ষা দেন এই আশায়।

এই দোকানের সামনে এসে সেদিন বাবা থমকে দাঁড়ালেন। এর আগে কুশাবর্তের সামনে থেকেই তিনি যেন কেমন উৎসুকভাবে মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন, বাতাসে কোন পরিচিত গন্ধের আভাস পেলে মানুষ যেমনভাবে সেই বাতাস আঘ্রাণ ক'রে ক'রে পরিচয়ের সূত্রটা ধরতে চেষ্টা করে সেই ভাবে। এখানে এসেও যেভাবে থমকে দাঁড়ালেন, মনে হ'ল সেই সূত্রেরই প্রান্ত মিলেছে এবার।

কুম্ভমেলা তার তুঙ্গে পৌঁচচ্ছে, কাল অমাবস্যার স্নান, তিন দিন পরেই সংক্রান্তি। পথ দিয়ে হাঁটা যায় না এত ভিড়। রাস্তায় গাড়ি চলা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, তাতেও প্রতিটি পদক্ষেপে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে এগোতে হচ্ছে। এত বড় খাবারের দোকানেও প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে সেই অনুপাতেই। বহু বাড়তি লোক কাজ করছে, হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে দোকানদার আর কর্মীরা। খদ্দেরের তাগাদা, হিসেব-নিকেশ, সাধুভোজন করিয়ে মহাপুণ্য অর্জনের আবেদন ও তা প্রত্যাখ্যানের চেঁচামেচিতে কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছেন না এমন অবস্থা। বাবাও যে স্থিরভাবে দাঁড়াতে পারলেন তা নয়, অবিরাম ধাক্কাধাক্কি ও গুঁতোগুঁতি চলল, তবে ততক্ষণে ভক্তের দল ওঁকে ঘিরে এক রকম একটা 'মনুষ্য প্রাচীর' করে ফেলেছে—তাতে বাবার গায়ে অত জোর ধাক্কা এসে লাগছে না।

বাবার অবশ্য এইসব ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচিতে ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। তিনি চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন বাইরের এই আহার্যলোলুপদের নয়—বিশেষভাবে দোকানের লোকগুলিকেই। যতগুলি ছোকরা খাবার ওজন, পাতা বা কাগজে বাঁধা, কি পরিবেশনের কাজ করছিল তাদের মধ্যে একটি বছর বারো বয়সের ছেলেতে এসে তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি আটকে গেল।

ফরসা-রঙ সুশ্রী চেহারার ছেলে একটি, আর যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বয়সে ছোট এবং ওরই মধ্যে একটু ভালো দেখতে। চটপটে, চোখ-মুখে বুদ্ধির আভাও আছে—এই পর্যন্ত। অনেক দেখেও অন্য কোন অসাধারণত্ব চোখে পড়ল না কারও। তেলে

ঘিয়ে ধুলোতে চিটচিটে একটি খাকী হাফপ্যাণ্ট প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে, গেঞ্জিটা ছেঁড়া, তার ফাঁক দিয়ে একটু পৈতের মতো কি দেখা যাচ্ছে, অন্য কোন গরম জামা নেই—তবে তার দরকারও বোধ হচ্ছে না অন্ততঃ এখন। কারণ এতেই এইসব ছেলের দল এক একজন ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

অতি সাধারণ, দোকানের একটি বালক কর্মী—এমন তো চারিদিকে হাজারে হাজারে—দরিদ্র বাপ-মায়ের সন্তান, লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায় নি, এই বয়সেই খেটে খেতে এসেছে। এ দৃশ্য অতি সাধারণ ও সনাতন। তবু ওর মধ্যেই বাবা কি দেখলেন কে জানে, বাবা চেয়েই রইলেন।

এত বড় একজন (অন্ততঃ সেইভাবেই প্রচার হয়েছে চারিদিকে) সাধু এমনভাবে একদৃষ্টে একটি ছেলের দিকে চেয়ে আছেন—এ দৃশ্য অভিনব বৈকি। অন্য সকলেই সচেতন হয়ে উঠল, ক্রমশঃ অন্য ছেলেদের বা মালিক শ্রেণীর কর্মীদের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে সে ছেলেটিও এদিকে চাইল, আর চোখে চোখ পড়তে চেয়েই রইল। তার হাতে যে খানিকটা জিলাপী একজনকে বেঁধে দেবার কথা—সে সম্বন্ধেও কোন হুঁশ রইল না। যেন দুটি চুম্বকে পরস্পরকে টানছে, এইভাবেই দু'জনের দৃষ্টি আটকে গেল।

তবে সে বেশি সময় নয়, একটু পরেই বাবা চোখের ইশারায় ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন, সেও জিলাপীর ঠোঙা ফেলে মন্ত্রমুগ্ধের মতোই এগিয়ে এল।

দোকানদাররা অবশ্যই খুশী হ'ল না, সে বিরক্তি গোপনেরও চেষ্টা করল না—কিন্তু এই সাধু সম্বন্ধে ভক্তদের অতিমাত্রায় সমীহ ও সম্ভ্রমের ভাব দেখে কোন প্রতিবাদ করতেও সাহস করল না। কে জানে কোন আখড়ার মোহান্ত হবেন, তাঁর ওপর চোট করতে গেলে যদি সে চোট হাজার গুণ হয়ে ফিরে আসে!

বাবা ডেকেছেন, ছেলেটিও এগিয়ে আসছে—চারিদিকের মানব-

প্রাচীর সরে গিয়ে পথ ক'রে দিল তাড়াতাড়ি। ছেলেটি আসছে কিন্তু তখনও তার লক্ষ্য ওঁর মুখের দিকেই, কতকটা ঘুমিয়ে হাঁটার মতোই হাঁটছে যেন—কাছে এসেও—আপনিই, নত হয়ে একেবারে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম জানাল।

বাবা তাড়াতাড়ি ওকে টেনে তুলে একেবারে বুকের কাছে চেপে ধরলেন। তারপর ডান হাতে মুখখানি তুলে ধরে বহুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে রইলেন ওর সুশ্রী বুদ্ধিদীপ্ত—তখনও অপাপবিদ্ধ মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন, 'তুম হামারা সাথ জায়েগা বেটা?'

ছেলেটি নীরবেই ঘাড় নাড়ল। সে যাবে।

'সন্ন্যাসী বনেগা? হামারা মাফিক?'

তাতেও নীরবে সম্মতি জানাল।

'তব আও।'

বাবা তার হাত ধরেই হাঁটতে শুরু করলেন এবার।

এতটা বাড়াবাড়ি মালিকদের সহ্য হবার কথা নয়, সহ্য হ'লও না। একজন লাফ দিয়ে ওপর থেকে নেমে এসে বলল, 'বাবা, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, এখন কাজের সময়, আমাদের কাছে নৌকৃরি করে ও।'

বাবা শান্ত অনুত্তেজিত মুখে একবার তার চোখের দিকে তাকালেন। কী ছিল সে চাহনিতে কে জানে, দোকানের লোকটি কেমন যেন সঙ্কুচিত জড়োসড়ো হয়ে গেল। তবু একবার ক্ষীণস্বরে জানাল, 'বাবা, এ লৌণ্ডা বাঙ্গালী।'

বাবা বললেন, 'জানি। সে ওর মুখ দেখেই বুঝেছি।'

শেষ চেষ্টায় কতকটা মরীয়া হয়েই বলে উঠল লোকটি, 'ওর বাবা-মা আছে। তাদের কী বলব? তারা আমাদের কাছে এসে যখন কৈফিয়ত চাইবে?'

'তাদের আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। এই এদের কাছে নাম-ঠিকানা জেনে নাও।'

আর কিছুই বলা গেল না। প্রায় ছেলেধরার মতোই ঘটনা ঘটতে

চলেছে—তবু কেউই কোন বাধা দিতে সাহস করল না।

পরের দিন উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় পাগলের মতো হয়ে ওর বাবা-মা খুঁজে খুঁজে ওপারে গিয়েছিল ওঁর আস্তানায়।

'ওকে নেবেন না বাবা। ও-ই একমাত্র রোজগারী, আমরা কোথাও কোন কাজকাম পাই নি। না খেয়ে মরব।'

বাবা শুধু বললেন, 'ওকে সন্ন্যাস দেব বলে নিয়ে যাচ্ছি। ভগবানের নাম ক'রে দিয়ে যাও। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের খাওয়া-পরার অভাব থাকবে না। তোমাদের অন্য ছেলেমেয়েও মানুষ হবে। ওর পুণ্যে তোমার বংশের ধারা পাল্‌টে যাবে। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাও। যেখানেই থাকো, বারো বছর পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবে ও।'

আবার সেই কণ্ঠ ও দৃষ্টির জাদু মন্ত্রবৎ কাজ করল।

ছেলেটির বাবা-মাও কোন প্রতিবাদ করতে সাহস করল না আর।

এর পরের দিনই সকলে দেখল, কুটিয়া খালি, বাবাও নেই, সে ছেলেটিও সম্ভবতঃ তাঁর সঙ্গে চলে গেছে।

বাবার সব আচরণই এত রহস্যময় যে, কুম্ভে এসেও বাবা যে প্রধান দুটি স্নান করলেন না—তা নিয়েও কোন আলোচনার আলোড়ন উঠল না।

এক

পাড়াটা কলকাতাতেই। হ্যাঁ, কলকাতা বলেই ধরতে হবে। কারণ ডাকের ঠিকানা লিখতে গেলে কলকাতার সংখ্যা সাত লক্ষ ধরে শেষে একটা সংখ্যা বসিয়ে ভারতীয় ডাক-ব্যবস্থার বিশেষ ডাকঘরটি চিহ্নিত করতে হয়।

তবু পূর্ব-দক্ষিণ কলকাতার এই প্রান্তে এসে পড়লে জায়গাটা যে এই গরবিনী শহরেরই একটা অংশ তা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। অ্যাসফল্টের রাস্তা বাদ দিলে—তাও ভাঙাচোরা, গর্ত ও কাদাতে সে চিহ্ন বেশির ভাগ স্থানেই অবলুপ্ত, বর্ষায় চিরস্থায়ী 'হাবোড়' হয়ে থাকে এক এক জায়গায়, মনে হয় বিহারের কোন হতদরিদ্র অবজ্ঞাত পল্লীতে এসে পড়েছেন; তেমনি চারিদিকে খাপরার বস্তি, তেমনি ধুলো উড়ছে, তেমনিই জলের কলে পঞ্চাশটা পাত্রের ভিড়; কলহ-কেজিয়া, দিনের বেলাও মাতলামির কদর্য দৃশ্য; তেমনি চারিদিকে কাদামাখা শুয়োরের পাল। মধ্যে মধ্যে ছোটখাটো কারখানা—তার কাজ যত, ধোঁয়া ঢের বেশি। পাকাবাড়ি যে নেই তা নয়—সেগুলিও এই পরিবেশের জন্যই ধূলিধূসর, মলিন।

অথচ এখানের মানুষ যে ইচ্ছা করলেই এর প্রতিকার করতে পারে তার প্রমাণ এরই মধ্যে পাঁচিলে ঘেরা ঐ হাউসিং এস্টেট। অনেকগুলো ব্লক, প্রত্যেকটাই চারতলা, প্রত্যেকেরই আটটা বা ষোলটা ক'রে ফ্ল্যাট। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বেশ একটু শ্যামলতার আভাস, পথের দু'দিকে সামান্য ফালি জমিতে নিবিড় দূর্বা ঘাস। বাগানের চেষ্টাও আছে কোথাও কোথাও, পাকা রাস্তাগুলো এখনো পাকা বলে চেনা যায়। মোটামুটি শান্ত পরিবেশ। ছেলেদের খেলার সময় ছাড়া চেঁচামেচি নেই।

ঝগড়াঝাঁটি ফ্ল্যাটের অধিবাসী পরিবারের নিজেদের মধ্যে বা এক ফ্ল্যাটের সঙ্গে আর এক ফ্ল্যাটের যে নেই তা নয়; অবশ্যই আছে, চিরকালই থাকবে—তবে সে সব কলহের শব্দ দুপুরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে না, সে কলহ কখনও কখনও কদর্য চেহারা নিলেও তার খবর অল্প দু'চার-জন ছাড়া রাখে না। দিনের বেলা মাতালের চিৎকার শুনতে হয় না।

এ গবর্নমেন্ট হাউসিং এস্টেটে যাঁরা একবার আশ্রয় পেয়েছেন, তাঁরা বড় একটা আর কোথাও নড়েন না। অসুবিধা যে কিছু কিছু নেই তা নয়; কাপড় শুকুতে দেওয়া যায় না, বড়ি আচারের জন্যে জানলা ভরসা, বিছানা মাতুর রোদে দিতে হলে বাইরে রাস্তায় এসে দিতে হয়। সে তৌলে মাপলে আবার সুবিধা অনেক। অফুরন্ত জল, বিদ্যুৎ বড় একটা যায় না, ভাড়া কম। বাড়ি নিজেদের মেরামত করতে হয় না, সরকারই ক'রে দেন। ভাড়া দীর্ঘদিন না দিলেও চলে, সরকারী কর্মচারীরা হুমকি দেন, উদ্বাস্তু করেন না। আর চলনসই ভদ্র প্রতিবেশী হলে তো কথাই নেই, বিপদে-আপদে তথাকথিত আত্মীয়দের শরণাপন্ন হতে হয় না।

কেউ ছাড়ে না, তবে ফ্ল্যাট বদল হয় মধ্যে মধ্যে। কেউ বা এক-ঘরের ফ্ল্যাটের সঙ্গে দু'ঘরা ফ্ল্যাট বদল করে। অর্থাৎ তাদের আয় বা পরিবারের জনসংখ্যা বেড়েছে—অপর পক্ষে সেই অনুপাতেই কমেছে।

এই রকম কারণেই বাণীব্রতবাবু তাঁর এক কামরার ফ্ল্যাট ছেড়ে দুই ঘরের প্রশস্ততর ফ্ল্যাটে চলে গেলেন, সে ফ্ল্যাটের ভাড়াটে নেপেন দত্ত এসে উঠলেন বাণীব্রতর পরিত্যক্ত এক-ঘরের, অর্থাৎ ষাট টাকা আট আনার ফ্ল্যাটে। একটাই ঘর, সদরের সামনেই রান্নার ব্যবস্থা, সেইখান দিয়েই ঘরে ঢোকারও পথ, এক হাত স্থানও কোথাও অতিরিক্ত নেই, হাঁফ ছাড়ার মতো। তবে হ্যাঁ, নামে এক ঘর হলেও আর একটি ছোট্ট ঘরও আছে ওর সঙ্গে, ভাঁড়ার বা খাবার ঘর হিসাবে। বোধ হয় আট ফুট লম্বা ও ঐ রকমই চওড়া ঘরের আকার। তা হোক, তবু ওরই এক প্রান্তে একটা তক্তপোশ পেতে তার নীচে ভাঁড়ার বাজার প্রভৃতি রাখার

চেষ্টা করলে একজন দেড়জন লোক শুতে পারে। আর তাই শোয় বেশির ভাগ এই সাড়ে-ষাট টাকার ফ্ল্যাটে।

নেপেনবাবুদেরও তাই করতে হয়েছে। লোকসংখ্যা অবশ্য তাঁদের বেশি নয়, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে। এরা দু'জনও সাবালক। ছেলেটির বয়স বছর ত্রিশ, মেয়েটির চব্বিশ-পঁচিশ। নেপেনবাবু আগে একটা কোন চা কোম্পানিতে চাকরি করতেন। সেটা উঠে যেতে কাজ গেছে, অন্য কোথাও কোন কাজ যোগাড় করতে পারেন নি। আগে নিচের ফ্ল্যাটের ছেলেমেয়ে পড়াতেন কিছু কিছু—মাস গেলে ষাট-সত্তর টাকা আসত, এখন তাও পারেন না, শরীর খারাপের অজুহাতে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন। ছেলে মণি কোনমতে বি-কম পাস করেছিল, কিন্তু কোথাও চাকরি-বাকরি পায় নি। আসলে সে চেষ্টাও তার ছিল না। কলেজে পড়তে পড়তেই সুশ্রী চেহারার জন্যে কিছু বড়লোকের ছেলে বন্ধু জুটেছিল, তারা কোন কাজ দিতে পারে নি, তবে কিছু দামী নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। তখন তাদের পয়সাতেই নেশাটা চলত, এখন তারা সবাই কাজকর্ম পেয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের আর নাগাল পাওয়া যায় না।

এখন কোথা থেকে পয়সা আসে তা বলা শক্ত। পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য গেছে, কিন্তু নেশাটা আছে। বড় চুল, গোঁফ-দাড়ি রেখে, বিচিত্র ধরনের বুক খোলা জামা আর বেড-কভার কাটা প্যান্ট পরে 'হিপি' সেজে ঘুরে বেড়ায়, তাদের দেখাদেখি অথবা নেশা ছোটবার ভয়ে বড় একটা স্নান করে না, ধুলোতে ঘামেতে মিলিয়ে চামড়ার অবস্থা রাস্তার পাগলের চেহারা নিয়েছে। মাঝে মাঝে রাত দুপুরে কোন কোন ছেলে (বা লোক) আসে, নিচে রাস্তা থেকে শিস দিয়ে ডাকে, অথবা রাত-জাগা পাখির মতো কর্কশ শব্দ করে, মণি উঠে বেরিয়ে যায়, ফেরে হয়ত তিন দিন বা চার দিন পরে, নেশায় বুঁদ হয়ে। নেশাও হরেক রকম, চরস গাঁজা মারিজুয়ানা থেকে শুরু ক'রে ঘুমের ওষুধ পর্যন্ত। ফলে বাড়ি ফিরে একটানা চব্বিশ-ত্রিশ এমন কি ছত্রিশ

ঘণ্টাও ঘুমোতে হয়।

একবার তো ওঁরা ভয় পেয়েই গিছুলেন—ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিলেন নেপেনবাবু, মেয়ে নীলা বাধা দিতে আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। সিঁড়ি ভাঙা-টাঙা ওঁর পছন্দও নয়, না যাওয়া হতে তিনি বেঁচেই গেলেন, আসলে মণির মায়ের বিলাপে ও প্রলাপেই যেতে হচ্ছিল। নীলা বলল, 'হ্যাঁ, তাহলেই কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হয়। শুনেছি, এ-সব নেশা বেআইনী, দামীও। ডাক্তার ডেকে পেটে পাম্প করলে কি বেরোবে তার ঠিকানা নেই। থানা পুলিস, এ-সব কোথা থেকে পায়, কি ক'রে খরচা চালায়—হাজার রকমের কৈফিয়ত। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোক আর কি!'

পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে জ্ঞান হতে বোনকেই বলেছিল—'কাল এক নতুন আড্ডায় গিয়ে পড়ে বড় বেকায়দায় পড়েছিলুম রে। শালারা কী সব মিশিয়ে এক ইঞ্জেকশন দিলে—মরফিন, ব্রোমাইড, কোকেন—এমনি কী সব। সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য। সেই শালারাই বোধ হয় পৌঁছে দিয়ে গেছে, আমি কিছু টেরও পাই নি।' বলে খুব খানিকটা হেসে নিয়েছিল আপনমনেই।

এ সব চলে কোথা দিয়ে, কি ক'রে? এ প্রশ্ন মণিকে ক'রে কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। মা বলেন, 'ও আর পাবে কোথা থেকে, বন্ধু-বান্ধবরাই খাওয়ায়। ভালবাসে ওকে, গান-টান গায় তো! তাতেও কিছু পায় বোধ হয়।'

'তুমি আর হাসিও না মা। ঐ গান! ওর চেয়ে রাস্তার ভিখিরীরা ভাল গান গায়। ঐ গান শুনে কেউ পয়সা দেবে না।'

'তবে যে বলে জলসা আছে—' মা বিরস মুখে বলেন। বর্তমান অবস্থায় মেয়ের কথার বেশী প্রতিবাদ করতে সাহস করেন না।

'থামো দিকি। জলসা ঐ ওদের নেশার আড্ডায়। আসলে ঐ যে গভীর রাত্তিরে উঠে চলে যায়—চুরি-ডাকাতি ক'রে বেড়ায়। নেশার লোভ দেখিয়ে একে দিয়েই করায়, কিংবা সঙ্গে রাখে। বোকা তো, নেশা ক'রে ক'রে হুঁশও নেই, যদি কখনও ধরা পড়ে ওকেই সামনে

ঠেলে দেবে।'

নেপেনবাবু বিজ্ঞভাবে বলেন, 'আমার তা মনে হয় না, ডাকাতি-টাকাতি করলে কিছু পয়সা অন্ততঃ ঘরে আনত, পয়সা হাতে পেলে খরচও করত পোশাক-আশাকে। আমার মনে হয় নকশালদের দলে গিয়ে পড়েছে, তারাই আসে রাত দুপুরে ডাকতে।'

'ঐ সুখেই থাকো। ঐ নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা আদ্ধেক মানুষকে দিয়ে যদি নকশালদের কাজ চলত তাহলে আর ভাবনা ছিল না।'

নীলা মুখ ঘুরিয়ে কতকটা আপন মনেই বলে।

তাহলে নেপেনবাবুদের সংসারটা চালায় কে? এই মৌলিক প্রশ্নটাই থেকে যাচ্ছে।

চালায় নীলা।

লেখাপড়া বেশীদূর হয় নি। হয় নি অর্থাভাবেই প্রধানতঃ। কতকটা নেপেনবাবুর উদ্যমের অভাবেও। স্কুলফাইন্যাল পাস ক'রে বসে ছিল, কুড়ি-পঁচিশ টাকার টিউশনি করত। শখ ছিল খুব গান শেখার। সেই উদ্দেশ্যেই ওর এক বান্ধবী অমিতা মুখার্জির বাড়ি যেত মধ্যে মধ্যে। তাকে একজন মাঝারি গাইয়ে গান শেখাতে আসেন, যদি অমিতার সঙ্গে ওকেও একটু শেখান, সামান্য টাকায়—এই আশাতে। কিন্তু তখন শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রীর প্রণয়ের প্রথম পর্ব চলেছে যথানিয়মে, ছকে-বাঁধা হিসেবেই—অমিতা তার মধ্যে বন্ধুর অযাচিত ও অনভিপ্রেত আসাটা পছন্দ করল না, এবং সে অনিচ্ছাটা ভাবে-ভঙ্গীতে আচার-আচরণে জানিয়ে দিতেও দেরি করল না। সুতরাং গান শেখা হ'ল না। তবে সে শিক্ষকটি ওর অবস্থা দেখে ও শুনে দয়া ক'রে উপার্জনের অন্য এক পথ দেখিয়ে দিলেন ওকে। এই পথ।

আজকাল য়্যামেচার ক্লাবের থিয়েটারে বা যাত্রায় আগের মতো গোঁফ কামিয়ে পুরুষকে মেয়ে সাজাবার রীতি নেই, ও ব্যবস্থা অচল এখন, মেয়েছেলেই আনতে হয়। যাত্রায় আজকাল টাকা অঢেল, তবে

তারা তেমনি বাছাই ক'রে ক'রে মেয়ে নেয়। বড় অভিনেতাদের কি মালিক পক্ষের পেয়ারের লোক না হলে ঢোকা শক্ত। কিন্তু য়্যামেচার ক্লাবের অত বাছবিচার নেই, চলনসই অভিনেত্রী হলেই তাদের চলে যায়। তারা নাটক করে নিজেদের কেরামতি দেখাতে, বড় নামকরা অভিনেত্রীর নাম বিজ্ঞাপন ক'রে তাদের তো আর টিকিট বিক্রি করতে হবে না। তবে ওরই মধ্যে একটু নাম করতে পারলে ও-অঞ্চলেও সুবিধা আছে। ঘনঘন ডাক আসে, আপিস ক্লাব তো বেশ ভাল টাকা দেয়।

নীলা কি করবে এ কাজ? ওর 'ফিগার' ভাল, মুখচোখ কাটা কাটা, গলাও ভাল। মনে হয় নিজে একটু চেষ্টা করলেই দাঁড়িয়ে যাবে। ওঁর এ লাইনে কিছু প্রভাব আছে। তা ছাড়া উনি চিনতেও পারেন কার দ্বারা এ কাজ হবে আর কার দ্বারা হবে না। নীলার বাচনভঙ্গী স্পষ্ট, তালব্য 'শ'য়ের উচ্চারণ হয়—ওকে দিয়ে হবে বলেই তাঁর ধারণা।

এইটুকু পথ পেয়েই বেঁচে গেল নীলা। নীলা অর্থে ওর বাপ-মা। নীলা বাঁচল বললে বোধ হয় এ ক্ষেত্রে সত্যের অপলাপই করা হয়। 'নীলারা' বলাই উচিত।

প্রথম প্রথম এক রাত্রের অভিনয়ে একশোর বেশি পেত না নীলা। কোথাও কোথাও পঁচাত্তরও নিতে হয়েছে। তারপর অবশ্য রেট বেড়েছে কিছু কিছু ক'রে। এখন একদিনে আড়াইশো এমন কি তিনশোও পায়। এক শাঁসালো আপিস ক্লাবে একবার পাঁচশোও মিলেছিল। তবে পাবলিক থিয়েটারের স্টেজ ভাড়া ক'রে অভিনয় করতে পারবে এমন ক্লাবের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ। পাড়ায় পাড়ায় বাঁশ ও তক্তপোশ দিয়ে স্টেজ বেঁধে অভিনয় করে যে সব ক্লাব—তাদের আর্থিক সঙ্গতি সীমাবদ্ধ। তারা ষাট থেকে দর করতে করতে একশো পর্যন্ত ওঠে, তাও পুরো টাকা অনেক জায়গায় আদায়ও হয় না। বেছে বেছে এমন নাটকও ধরে, যাতে—ওখানের ভাষায়—'ফিমেল পার্ট' কম। তাছাড়া অমিতার গানের মাস্টার—পরবর্তীকালে অমিতার স্বামী, মলয়বাবু আগেই হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছেন—এ সব জায়গায় পথে-ঘাটে অভিনয় করে বেড়ায়, এ নাম

রটে গেলে বড় ভাল ক্লাব কেউ ডাকবে না, বেশী টাকা তো পাবেই না কোনকালে। মানে জাতও যাবে পেটও ভরবে না। একশো টাকায় মাসে দশটা অভিনয় করার থেকে আড়াইশো টাকায় চারটে অভিনয় করা অনেক ভাল।

আজকাল যাত্রার দলে ঢুকলে বিস্তর মাইনে পাওয়া যায়, বাঁধা কাজ। শুনে লোভ হয় খুব। কিন্তু ও-পাড়ায় পরিচয় ক'রে দিতে পারে এমন কাউকে পায় নি নীলা।

এখানেও 'উন্নতি' সোজা পথে হয় নি।

তার জন্যে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে।

আসল প্লের আগে রিহার্স্যালে যেতে হয় দু'-তিনদিন, তার মধ্যে একদিন স্টেজেও। সাধারণতঃ পাঁচ-ছ' ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। কেন-না আজকাল অধিকাংশ নাটকই তিন ঘণ্টায় শেষ হয়। সেই হিসেবেই স্টেজ ভাড়া দেন মালিকরা—আগে পিছনে কতটা সময় লাগা উচিত সে সময় ধরে।

রিহার্স্যালে অতটা সময় মেপে কাজ চলে না। সবাই আসতে, রিহার্স্যাল চলার সময় ভ্রম ত্রুটি সংশোধন ক'রে নিতে, কাউকে কাউকে দিয়ে শিক্ষকের নির্দেশ মতো বারবার বলিয়ে বলিয়ে 'রপ্ত' করাতে কিছু কিছু দেরি হয়ই। সব ক্লাবেই অভ্যন্তরীণ 'অডিটার' বা হিসাব-পরিদর্শকের মতো একজন নিজস্ব 'রিহার্স্যাল মাস্টার' থাকেন, আবার এক এক জন পাকা লোককে বাইরে থেকেও আনা হয় টাকার জোর বুঝে। কারণ এঁদের এ জন্যে ফি দিতে হয়। অনেক সময় বেশী টাকা দিয়ে পাবলিক থিয়েটারের নামকরা অভিনেতাকেও আনা হয়।

কিন্তু কাউকে কাউকে, বিশেষ ক'রে কোন কোন কাঁচা মেয়েকে ঐ হিসেবের বাইরেও কিছুক্ষণ থাকতে হয়। তা নইলে রেট বাড়ে না। নীলাকেও সেই প্রক্রিয়াতেই প্রথম দিকে রেট বাড়িয়ে নিতে হয়েছে। এমন কি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক ছাড়াও (সে পারিশ্রমিকও প্রথম কথা-বার্তায় যা ঠিক হয়েছিল, পাওয়ার সময় বেড়ে গেছে) রিহার্স্যালে

আসার জন্যে আলাদা 'ভাউচার' হয়েছে, ক্ষেত্র বুঝে পঞ্চাশ, ষাট-পঁচাত্তর টাকা পর্যন্ত। অভিনয়ে প্রয়োজন হবে, এই অজুহাতে ভাল শাড়িও মিলেছে ক্লাবের টাকায়।

এর জন্যে নীলার ফিরতে এক-একদিন অনেক দেরি হয়ে যায়। আট ঘণ্টা ন' ঘণ্টাও হয়ে যায়।

প্রথম যেদিন এমনি অস্বাভাবিক দেরি হয় সেদিন ওর বাপ-মা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু যখন ফিরল ও, ওর বিবর্ণ ক্লান্ত মুখ, বসে যাওয়া চোখের দিকে চেয়ে—কোন দিকে না তাকিয়ে মাথা হেঁট ক'রে বাড়ি ঢুকে সোজা গিয়ে সেই অবস্থাতেই বিছানায় শুয়ে পড়তে দেখে—অনাবশ্যক বোধেই কোন প্রশ্ন করেন নি ওঁরা, করতে সাহস হয় নি।

সে রাত্রে নীলা কিছু খায়ও নি। ওর মা একবার ক্ষীণকণ্ঠে 'উঠে চান করে যা হোক কিছু মুখে দিলি নি কেন মা' বলা ছাড়া বেশি অনুরোধ উপরোধ করতে ভরসা পান নি। বিছানায় পড়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত নিঃশব্দ কেঁদেছে নীলা, তার পাশে শুয়ে সে-ইতিহাস টের পেতে কোন অসুবিধা হয় নি মায়ের। তবু নিজেও সেই সঙ্গে কাঁদা ছাড়া একটি সান্ত্বনার বাক্যও উচ্চারণ করতে পারেন নি মা।

তারপর সয়ে গেছে বৈকি।

সইয়ে নিতে হয়েছে, নইলে নেপেন দত্তর সংসার চলে না। চারটে প্রাণীর খাওয়া-দাওয়াই তো শুধু নয়—বাড়িভাড়া, ধোপা-নাপিত, দুধ, ঝিয়ের মাইনে, ঘুঁটে-কয়লা, অতিথি-অভ্যাগত, সাবান, তেল, ক্রিম, স্নো, শ্যাম্পু—এগুলোও আবশ্যিক বস্তু আজকাল, বিশেষ এক্ষেত্রে—বিবিধ ও অগণিত খরচ। প্রাক্তন বিপুল দেনাও কিছু কিছু শোধ করতেই হয়। ডাক্তার ওষুধের প্রশ্ন তো আছেই। মণির মধ্যে মধ্যেই বাইরে নেশার খরচ না জুটলে মার কাছ থেকে কেড়েবিগড়ে চেঁচামেচি ক'রে টাকা নিয়ে যায়, মা-ও 'না' বলতে পারেন না। ছোট বোন ভাল রোজগার করছে এই তার ধারণা, মা কিপ্পুস বলে দিতে চায় না। নেপেনবাবু পাইপ খেতে ভালবাসেন, এতদিন অর্থাভাবে বন্ধ ছিল, বিড়ি

খেতে হত। মেয়ে আবার সে ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে।

সইয়ে নিতে হয়েছে আরও অনেক কিছু।

অভিনয়ের ডাক, যেখানে বেশী টাকা পাবে, মাসে দুটো-তিনটের বেশি আসে না। ওর পরিচিত প্রভাবশালী ব্যক্তির পরিধি খুব বিস্তৃত নয়, নতুন নতুন আপিস ক্লাবে প্রবেশাধিকার পায় না। কয়েকটি বাঁধা ঘরেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, নীলার এমন কোন অসাধারণ দক্ষতাও প্রকাশ পায় নি যে, চারিদিকে নাম ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং সংসারের জন্যেই অপরের অনুগ্রহ নিতে হয়। সে অনুগ্রহ যিনি দেবেন, তিনি 'অহেতুক কৃপা' করবেন এমন আশা করার কোন কারণ নেই। নীলার অপর দিকের যে আকর্ষণ তা এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডির পরিচিত কর্মকর্তাদের কাছে পুরনোও হয়ে এসেছে।

কেবল এক বড় ক্লাবের ধনী সেক্রেটারী—তাঁর পয়সাতেই ক্লাব চলে, ক্লাবের এত নাম, নতুন নতুন নাট্য-প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব হয়েছে—সেই বিমলবাবুর ভাল লেগেছে নীলাকে।

ভাল লেগেছে বোধ হয় এই জন্যে যে, অপর প্রসাদ-প্রার্থিনীর মতো নিজেকে তাঁর দৃষ্টির সামনে 'মেলে ধরার' আগ্রহ নেই এই কুণ্ঠিতা মেয়েটির, লোভনীয় ক'রে তোলার উৎসাহ নেই। এখনও ওর সঙ্কোচ সম্পূর্ণ কাটে নি, এখনও কিছু লজ্জা অবশিষ্ট আছে।

এই বিমলবাবু ওর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে 'দেখা করতে' আসেন আজকাল। নতুন নতুন 'আইডিয়া' তাঁর—আধুনিক নাট্য-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে নীলার সঙ্গে আলোচনা ক'রে তিনি তৃপ্তি পান। নিজেও একটু-আধটু আধুনিক নাটক লেখার চেষ্টা করেন, যেটুকু যখন লেখা হয় ওকে পড়ে শোনান।

বিমলবাবু আগে সপ্তাহে দু'-তিন দিন আসতেন, এখন প্রায় প্রত্যহই আসেন—কদাচিৎ নীলার অভিনয়ের দিন পড়লে বা নিজের কোন জরুরী কাজ থাকলে সে দিনটা আসা বন্ধ থাকে। বিমলবাবু যখন আসেন, তখন ফ্ল্যাটের একটি মাত্র যে ঘর, যেখানে ওঁদের পুরনো

আমলের খাট, জরাজীর্ণ বিছানা এবং মেঝের বিছানা খাটের নীচে গোঁজা, বিক্রয়াবশিষ্ট দু'টি চেয়ার ও একটি টেবিল থাকে—সেইখানে এনেই খাটের ওপর বসাতে হয়। বাইরের কোলাহলে আলোচনার ব্যাঘাত ঘটে বলে দরজা বন্ধ ক'রে দেয় নীলা। অগত্যা নেপেনবাবু ও তাঁর স্ত্রী, নীচের রাস্তায় চকচকে বড় গাড়িখানা দেখলেই গিয়ে সেই ছোট ভাঁড়ার ঘরটায় আশ্রয় নেয়। তাও যেদিন মণি বাড়ি ফিরে তার অভ্যস্ত কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা শুরু করে, সেদিন মাকে চৌকির পাশে দেড় হাত চওড়া মেঝেতে বসেই অপেক্ষা করতে হয়, রান্নার কাজ শুরু করা যায় না, কারণ সে ধোঁয়া বা ফোঁড়নের গন্ধ ও-ঘরে ঢোকে কিছু কিছু, তাতে বিমলবাবুর কষ্ট হয়। আর নেপেনবাবু ফ্ল্যাটের বাইরে একটা ভাঙা টুলে বসে পাইপ টানেন। এ পর্ব চলে রাত ন'টা সওয়া ন'টা পর্যন্ত। বিমল-বাবু বিদায় নিলে তবে উনুনে আঁচ পড়ে।

বিমলবাবু যেখানে নিত্য আসা-যাওয়া করবেন সে ঘরের শ্রী ফিরবে না, তা সম্ভব নয়। বিছানাপত্র নবজীবন লাভ করে, দরজা-জানলায় ভাল পরদা পড়ে, ভাল চেয়ার আসে। দামী চায়ের সরঞ্জাম এসে যায়। নীলার নতুন নতুন শাড়ি আসে, তার মধ্যে কিছু কিছু রীতিমতো মূল্যবান। নগদ টাকাও বালিশের তলায় রেখে যান মধ্যে মধ্যে দুশো-আড়াইশো করে। এমন কি নীলার চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে টনিক ও টিনের পানীয় ব্যবস্থা করতেও তাঁর ভুল হয় না।

এ ব্যবস্থায় সকলেই সুখী, কেবল নীলা ছাড়া। নিজেকে সে যে অন্য নামে 'রক্ষিতা'র স্তরে এনে ফেলেছে, ফেলতে বাধ্য হয়েছে—এই গ্লানিটা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। বিমলবাবুর পক্ষে যে ওকে বিয়ে করার কোন উপায় নেই, তাঁর স্ত্রী আছে, দু'টি ছেলেমেয়ে, এ কথা জানিয়ে প্রায়ই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন বটে, তবে তাতে নীলা কোন সান্ত্বনা পায় না। বিমলবাবু যদি কিছুদিনের জন্যে তাকে বাইরে কোথাও নিয়ে যেতেন এখানে প্রত্যহ আসার চেয়ে, তাতে এতটা লজ্জা ও অপমানবোধের কোন কারণ থাকত না।

দুই

নীলাদের ফ্ল্যাট তিনতলায়, ওদের ঠিক নীচে একতলায় থাকে দেবুরা। দেবু, দেবুর দাদা, ওদের এক বুড়ো ছোট্‌ঠাকুর্দা—এই নিয়ে সংসার। মা-বাবা, কোন দিদি কি পিসীও নেই। একটা ঠিকে ঝি আছে, সে-ই ঘরের কাজ, বাসন মাজা এবং রান্না করে, সে যেদিন আসে না দেবুরা দুই ভাই হাতাপিতি ক'রে সেরে নেয়। রান্নাও বাধ্য হয়েই শিখেছে, তবে ডালটা যদি পুড়ে কয়লা হয়ে যায় কিংবা চচ্চড়ির জল না মরে—তাহলে ওদের খুব দোষ দেওয়া উচিত নয়।

দেবুর দাদা মাস্টারি করে, সম্প্রতি ঢুকেছে। দেবু এখনও কোন চাকরি-বাকরি পায় নি, একটা দোকানে কাজ পেয়েছিল, ওর দাদা নিতে দেয় নি। বি-কম পাস ক'রে বসে আছে. গোটা দুই টিউশনি করে, তাতে শ'খানেক টাকা মাত্র পায়। সে টাকায় নিজের পোশাক বা খেলা দেখা, সিনেমা দেখার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। ও কোন চাকরি-বাকরি পেলে—দোকানে আপত্তি, বড় দোকান বা 'মার্চেন্ট আপিসে' আপত্তি নেই—ওর দাদা বিয়ে করবে, এই তার ইচ্ছে। কারণ বিয়ের আগে বাড়ি বদল করা দরকার। এই এক এবং তার সঙ্গে আর সিকিখানা ঘরে সে বৌ নিয়েই বা থাকবে কোথায়, এদেরই বা কোথায় থাকতে বলবে! এতকাল পরে কিছু ছোট্‌-ঠাকুর্দাকে পথে বার ক'রে দেওয়া যায় না।

এই ছোট্‌ ঠাকুর্দাটি তাদের সম্পূর্ণ কুপোষ্য একটি। কোন কাজেই লাগে না, সে শক্তিও নেই ; আবার চুপ করেও থাকতে পারে না—অবিরাম উপদেশ ও পরামর্শ দেবার চেষ্টা করে।

ঠাকুর্দার আপন ভাই, বাবার কাকা। আত্মীয় বলতে এই একটিতেই ঠেকেছে এখন। যৌবনে থিয়েটার-থিয়েটার ক'রে মেতেছিলেন—অভিনেতা হয়ে জগৎজোড়া খ্যাতিলাভ করবেন (দেবু বলে, 'জগৎ

একেবারে! আম্বা দেখো দিকি!') এই আশায়। 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না—তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা দিবসনিশি'—মহাকবির এই পংক্তি দু'টি ওঁর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

বড় অভিনেতাদের হাতে-পায়ে ধরে, তাদের ফাইফরমাস খেটে, মোসাহেবী ক'রে, তাদের মেয়েমানুষের বাড়ি ধন্না দিয়ে, অথবা মালিক কি কর্তাব্যক্তি স্থানীয় কারও বাজার করে দিয়ে (দেড় টাকার জিনিস এক টাকা বলে), প্রয়োজন হলে জুতোর ফিতে খুলে কি পরিয়েও এক আধবার ভাল সুযোগ যে পান নি তা নয়—কিন্তু কোন ভূমিকাতেই এমন কোন দক্ষতা দেখাতে কি ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি যাতে পরে আরও বড় পার্ট কি ভূমিকা দেওয়া যায়। ফলে চিরদিন তৃতীয় শ্রেণীর আর্টিস্ট হয়েই রইলেন হীরু দত্ত।

তাতে বেতন বা পারিশ্রমিক মিলত সামান্যই, তাও নিয়মিত পেতেন না, বলাই বাহুল্য। যা পেতেন তাতে নিজের কাপড়-জামা (হীরুবাবুর ভাষায় 'অ্যালব্য-পোশাক, এটা ঠিক চাই বাবা, নইলে ও লাইনে পাত্তা মিলবে না।') পান সিগারেটের খরচও চলত না, তার জন্যে ভাইপো অর্থাৎ দেবুর বাবার কাছে মাঝে মাঝে হাত পাততে হত। দু' টাকা এক টাকার বেশি তাঁরও দেবার সামর্থ্য থাকত না, তবে তাও দেবার লোক হীরু দত্তর আর কেউ ছিল না। অন্য আত্মীয়রা কেউ সম্পর্ক রাখে নি, কিন্তু কে জানে কেন—দেবুর বাবা বিজনবাবু এই অভাগা 'ভ্যাগাবণ্ড' কাকাকে একটু প্রশ্রয়ের চোখে দেখতেন।

তার কারণ বোধ হয় এই যে, বিজনবাবু নিজেরও প্রথম যৌবনে এই পথে খ্যাতি ও সমৃদ্ধি লাভের ঝোঁক হয়েছিল। অভিনেতা হতে পারেন নি তবে ঐ পাড়ায় কিছুদিন যাতায়াত করার ফলে কিছু কিছু নেশাভাঙ ও অল্পস্বল্প অন্য উচ্ছৃঙ্খলতাও শুরু করেছিলেন। কিন্তু দেবুর ঠাকুর্দা দূরদর্শী মানুষ, তিনি ছেলের মতিগতি দেখে উঠে পড়ে লেগে বিস্তর খুঁজে-পেতে একটি ফুটফুটে মেয়ে দেখে বিজনবাবুর বিয়ে দিয়ে দিলেন। তার আকর্ষণেই হোক, অথবা

সংসারের দায়িত্ব এসে ঘাড়ে পড়াতেই হোক, ও-পথ ছেড়ে দিয়ে একটা ভদ্র চাকরি যোগাড় করে নিয়ে পুরোপুরি সংসার পেতে বসলেন। তবু, ক্ষোভও একটা ছিল বোধ হয়, সেইজন্যেই ছোট্‌কাকে একটু স্নেহের চোখে দেখতেন, একেবারে বিমুখ করতে পারতেন না।

খ্যাতি যশ অর্থ কিছুই পেলেন না কিন্তু এ লাইনের আনুষঙ্গিক অমিতাচারে স্বাস্থ্যটি খোয়ালেন হীরু দত্ত অকালেই। প্রথম যৌবনে চেহারা ভাল ছিল, সুপুরুষও বলত কেউ কেউ। সুতরাং বড় 'নায়িকারা' না হোক 'সখীর দল' বলা হত যাদের সেকালে (হায়, একালের নাটকে এদের প্রয়োজন হয় না, বহু মেয়ের কাজ চলে গেল !), তাদের প্রসাদ লাভে কোন অসুবিধা হয় নি। বাসার দরকারই হত না হীরুবাবুর, এক এক রাত এক একজনের ঘরে কেটে যেত। আর মোসাহেবীর পুরস্কার অর্থে নয়—সুরায় মিলত। অর্থাৎ দু'রকম নেশাই চলত 'ফোকটে'।

শরীর যখন গেল তখন আর একবারেই কেউ কোন পার্টি বা তার জন্যে টাকা দিতে রাজী হ'ল না। তবু অভ্যাসবশতঃই কতকটা, অথবা আর কোন অবলম্বন ছিল না বলেই—শুধুশুধুই থিয়েটারে থিয়েটারে আরও কিছুদিন ঘোরাঘুরি করেছিলেন। কিছু কিছু—একদা বিখ্যাত এখন প্রায় বিস্মৃত—হীরুর ভাষাতেই 'নামকাটা সেপাই' মিলে মধ্যে মধ্যে দল গড়ে এক-আধটা পুরনো নাটক—যেমন 'কর্ণার্জুন', 'জনা', 'প্রফুল্ল', 'সাজাহান'—কোন স্টেজের সঙ্গে এক রাত্রির বন্দোবস্তে মঞ্চস্থ করতেন (এখনও করেন অবশ্য)—কিংবা তথাকথিত পার্টি নিয়ে কলকাতার বাইরে যেতেন ভাগ্য-পরীক্ষা করতে—হীরুবাবু একরকম গায়ে পড়েই তাদের দলে গিয়ে খাটাখাটুনি করতেন। তবে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে যা থাকত—কখনও কখনও কিছুই থাকত না—তা উদ্যোক্তারাই ভাগ ক'রে নিতেন, অতিথি 'স্টার' এক-আধজনকে তো দিতে হতই, হীরুর মতো রবাহুতদের ভাগ্যে কিছুই জুটত না, ঐ গাড়িভাড়া, খোরাকি আর এক-আধটা বিড়ি—এ ছাড়া। হীরুবাবুকে 'চোরের রাত্রিবাসই লাভ', এই সান্ত্বনা পেয়েই খুশী থাকতে হত। কখনও-সখনও চার-পাঁচ টাকা,

কখনও তাও মিলত না।

এবার চোখে অন্ধকার দেখলেন, তবু যেতেন, থিয়েটারের ভেতরের ঘরে যে আড্ডা হয় তার এক পাশে গিয়ে বসে থাকতেন, ওপর-পড়া হয়ে কথা কইতেন। শেষে এক সময় লক্ষ্য করলেন, কেউ তাঁর কথার কোন জবাব দেয় না, তিনি যে কথা বলেছেন সে তথ্যটাও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। উপরন্তু পর পর দু'দিন একটা খালি স্টেজে শুয়েছিলেন রাত্রে, ধুলোয় পুরু-হয়ে-যাওয়া শতরঞ্জির ওপর—শুনে সে-থিয়েটারের ম্যানেজার শিফ্‌টারদের দিয়ে অপমান করালেন।

আর কোথাও কোন আশ্রয়ের আশা, এমন কি একবেলা একমুঠো অন্নরও সম্ভাবনা রইল না। অগত্যা এখানে এসে এই এদের—মানে দেবুদের সিকিখানা ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

এরাও তাড়াতে পারে নি বাবার কথা মনে করে। ঐ ঘরেই দিনরাত বসে বসে হাঁপান—এই হাঁপানিটা যৌবনের অমিতাচারের ফল, ডাক্তাররা বলেছেন—আর বিড়ি খান! চাও খেতে চান মধ্যে মধ্যেই, যে ঝি-টি রান্নাবান্না করে তাকে তোষামোদ ক'রে জোটেও বাড়তি দু'তিন কাপ—কিন্তু তা সব সময় কি সব দিন হয় না। নিজেরও আর এমন সামর্থ্য নেই যে তৈরী ক'রে খাবেন। অভ্যাসও নেই। বিড়িই ভরসা। দেবু বাজার থেকে ফেরার সময় এক বাণ্ডিল করে এনে দেয়, তাই সারাদিন চলে।

হীরুবাবু এখানে সবচেয়ে যেটা অসুবিধে বোধ করতেন—সেটা হ'ল লোকের অভাব, মানে কথা কইবার লোকের অভাব।

অন্য ফ্ল্যাটের বা অন্য ব্লকের অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা যে করেন নি তা নয়—কিন্তু তারা ওঁর ঐ ছেঁড়া ময়লা শার্ট (দেবুর দাদার বাতিল করা) আর চিটচিটে ময়লা তেলচিটে গন্ধওলা লুঙ্গি দেখে কেউ বিশেষ প্রশ্রয় দেয় নি। বরং উনি যে সম্পূর্ণ অনভি-প্রেত—তা ভাবে-ভঙ্গীতে, কথাবার্তার সংক্ষিপ্ততায় ও বিরসতায় বুঝিয়ে দিতে দ্বিধা করে নি।

হীরু দত্ত হতভাগা কিন্তু একেবারে নির্বোধ বা অন্ধ নন। তিনি ওদের

মনের ভাব বুঝে আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেন নি, এখন এই ক্ষুদ্রতম ঘরের একমাত্র জানলা দিয়ে বাইরের 'বিপুলা পৃথ্বী'র তথা জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেই সন্তুষ্ট থাকেন। কখনও-সখনও কোন ছেলে পথে খেলতে খেলতে বলের সন্ধানে এদিকে এসে পড়লে তাকে ডেকে কথা বলার চেষ্টা করেন কিন্তু তারাও দাঁড়ায় না, 'আসছি দাত্নু' বলে পালায়। দূরে গিয়ে বন্ধুদের বলে, 'ঐ রে, পাগলা বুড়োটা আবার ধরেছিল!' সেটাও হীরুবাবুর শ্রুতিগোচর হতে বাধা পায় না, কারণ ছেলেরা গলা নামিয়ে কথা কইবে কেন?

এরই মধ্যে একদিন ছোট নাতির মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে ওদের ঠিক ওপরে তেতলায় যারা থাকে তাদের মেয়েটি থিয়েটার করে। অর্থাৎ অভিনেত্রী। খুব উঁচুদরের কেউ নয়—য়্যামেচার ক্লাবে প্লে করে মধ্যে মধ্যে।

তা হোক, ছোট বা বড়, য়্যামেচার ক্লাব কি পাবলিক থিয়েটার—এ সব তথ্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ওঁর কাছে। থিয়েটার করে, অভিনেত্রী—এইটে শোনামাত্র যেন এই বয়সেও সর্বাঙ্গে একটা ইলেকট্রিক শক অনুভব করেন হীরু দত্ত। ক নম্বর ফ্ল্যাট, কর্তার নাম কি—আর একবার ভাল ক'রে শুনে নিয়ে সেই দিনই আলাপ করতে যাবেন স্থির ক'রে ফেললেন। এই কোটর, অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে যে কোন জায়গায় যাবার জন্মে অনেকদিন ধরেই ছটফট করছিল মন—এ তো বলতে গেলে উত্তম সুযোগ।

সেই দিনই এরা দু'ভাই বেরিয়ে গেলে—দেবু সম্প্রতি এই মাস দেড়েক হল একটা বড় প্রেসে কাজ পেয়েছে, অস্থায়ী অবশ্য, তবে স্থায়ী হতে পারে—হীরুবাবু তাঁর প্রাচীনতম তেল-চিটচিটে ময়লা লুঙ্গীর ওপর দেবুরই একটা আধময়লা পাঞ্জাবি জড়িয়ে—এটা কাচতে দেবার জন্মে এক পাশে জড়ো করা ছিল, ঝি দিয়ে আসবে এক সময়ে—ঠুকঠুক করে ওপরে গিয়ে কড়া নাড়লেন।

'কৈ গো, আমার দিদিভাই আছেন নাকি ?'

দোর খুলে দিলেন নেপেনবাবুই। কিন্তু এই অদ্ভুত মূর্তিটিকে দেখে ভেতরে আসতে বলবেন কি দরজা বন্ধ ক'রে দেবেন ওর মুখের ওপরই— ঠিক করতে না পেরে কিছুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়েই রইলেন। 'সাহায্য-প্রার্থী' (ভিক্ষা শব্দটার একটু মার্জিত অর্থাৎ মূল্যবান বিকল্প—ভিক্ষে চাইলে দুই নয়া পয়সাও দেওয়া যায়, সাহায্য এক টাকার কমে হয় না।) এই ধরনের বৃদ্ধ প্রায়ই আসে আজকাল, আবার কোন দালাল ক্লাবের কাজ যোগাড় ক'রে দিয়ে শতকরা দশ টাকা নেবে—এমন লোকও একেবারে বিরল নয়। দ্বিধা সেই জন্যেই।

'নমস্কার। আপনিই তো নেপেনবাবু ? এত দিন আলাপ হয় নি, মানে ভরসা করি নি আসতে। আমার মতো বেকার বুড়োকে কেউই তো আমল দিতে চায় না। তা ধরুন গে আমরা আপনাদেরই সগোত্র। আপনারাও কায়েত তো ? আমরাও তাই। ঠিক আপনাদের পায়ের তলায় বাস করি। আমার নাম হীরু—ছিলুম হীরেন কিন্তু এ লাইনে এসে ঐ ডাক নামটাই রয়ে গেল। কেউ আর আসল নামে ডাকে না। ঐ যে নেপা বোস, ওরও তো ধরুন গে আপনার নামেই নাম—নৃপেন্দ্র নাথ বোস, ওরা পুরুষানুক্রমে দোয়ারী দত্তদের মোসায়েব, সেই সুবাদেই অমর দত্তর থিয়েটারে কাজ করত—তা তাকে নৃপেন বোস বললে কে চিনবে বলুন, নেপা বোস বললে এক ডাকে সারা বাংলার লোক চিনে ফেলবে।...একটু বসতে পাবো ? অসুবিধে হবে খুব ? আমি মেঝেতেই দিব্যি বসতে পারবো। এতটা সিঁড়ি ভেঙে এসে হাঁপ ধরছে। একেবারেই বেরুনো নেই তো, অব্যেসটা চলে গেছে। আগে এই ধরুন গে ঠ্যাং দুটো চড়েই গোটা কলকেতা চষে ফেলেছি !'

অগত্যা বলতে হয়—একটু অপ্রতিভ ভাবেই—'অসুবিধে হবে কেন, আসুন, আসুন। চেয়ার আছে ঘরে, পাখাও আছে, ভাল করে বসুন।'

বসে খানিকটা দম নিয়ে হীরুবাবু বলেন, 'আজই শুনলুম কিনা কথাটা, আমার নাতি দেবেন বললে, আমার এই দিদিভাইও নাকি

থিয়েটার করেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরনো নেশাটা চুলবুলিয়ে উঠল। আমিও ঐ লাইনের কিনা, থিয়েটারেই ধরুন গে সারাজীবন কাটল। "আজীবন সার দিনু জীবন প্রান্তরে, ফললাভ কি হল আমার!" আমারও সেই কথা বলতে ইচ্ছে করে। নাটকেরই কথা, রঘুবীর বোধহয়। আজই দেখছেন রুগ্ন বৃদ্ধ স্থবির—এককালে এ লাইনের সবাই এক ডাকে চিনত। এমন কোন বড় এস্টেজ নেই যেখেনে আমি প্লে করি নি। মস্ত মস্ত নামজাদা বাঘা অ্যাক্টরের সঙ্গে থেকেছি, বড় বড় রাশভারী ম্যানেজারের সঙ্গে ঘর করেছি। আজই দেখছেন এই রকম নখদন্তহীন হয়ে পড়েছি। গিরীশ ঘোষের ঐ লাইনটা—"দেহপট সনে নট সকলি হারায়"—আগে তত বুঝিনি, এখন বুঝছি হাড়ে হাড়ে!

'সে যাক গে, তা শুনে বড় আনন্দ হল, ভাবলুম তবু এতদিন পরে একটা আত্মীয় পেলুম বলতে গেলে। মনে করলুম তা যাই, আজই একবার যেয়ে দেখে আসি আমার দিদিমণিকে। দেবুরা আমার নাতি, আপন দাদার পৌত্তুর, তাদের চেয়ে কোন্ না ঢের ছোট হবে আমার এই দিদিটি। তা ধরুন গে নাতনী হল তাহলে। আপনারই বা কি বয়েস, এখনও একবার বে দিয়ে আনা যায়। চুলও তো বারো আনা কাঁচা।'

এক নিঃশ্বাসে এত কথা বলে খানিকটা হাঁফিয়ে নেন হীরুবাবু, তারপর দরজার পরদাটা লক্ষ্য ক'রে একটা হাঁক পাড়েন, 'কৈ গো, আমার নীলা দিদিমণি, এসো না, একবার দেখে যাই!'

পরদার এপার আর ওপার, সাড়ে তিন ফুট চলন আর তার সঙ্গে লাগোয়া খাঁচার মতো ছোট্ট একটি ঘর। এ ঘরে লোক এলে মেয়েদের তো থাকার ঐ জায়গাটুকুই ভরসা। কাজেই হীরুবাবুর দীর্ঘ বক্তৃতা শোনার কোন বাধা ছিল না। তাকে যে যেতেই হবে একবার ওঁর সামনে—এই জন্যেই বুড়োটা এসেছে—এটুকুও নীলা বুঝেছিল। সে এর মধ্যেই আটপৌরে শাড়িখানা পাল্টে নিয়েছে—এবার এ ঘরে ঢুকে নমস্কার ক'রে দাঁড়াল।

নেপেনবাবু অনাবশ্যক ভাবেই বললেন, 'এইটি আমার মেয়ে নীলা। এই একটিই মেয়ে।'

'বা-বা-বা। আহা, দিদি আমার যেন সরস্বতী প্রিতিমে। বোসো না ভাই, তুমিই বলছি, কিছু মনে করো না। আমার নাতিদের থেকেও তুমি ছোট। না, সোন্দর বলছি না, সে কথা বললে খোসামোদ করা হবে—তবে চমৎকার একটা ছিরি—যাকে আমরা সেকালে লাজ্জত বলতুম—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওটা ঠিক বোঝানো যাবে না নেপেনবাবু। তবে ভাই আমি বুড়ো হয়েছি তো, আর রেখে ঢেকে কথা কোন দিনই বলি নি, স্পষ্টই বলছি, একটু ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে নিও। তোমার ভাই বড় সাত্ত্বিক ভাব মুখে—বনেদী ভদ্দরলোকের মেয়ের যেমন হওয়া উচিত, আজকাল অবিশ্যি গরু ছাগল সব এক গোত্তর হয়ে গেছে, কে ভদ্দরলোকের মেয়ে আর কে বাজারের মেয়ে চেনা যায় না—কিন্তু তুমি তো থিয়েটারে নাম করতে পারবে না। এই য়্যামেচার ক্লাবেই মাঝারি দরের য়্যাকট্রেস হয়ে থাকতে হবে—না-পাষ্যিমানে নাতজামাই ভাতার গোছের।'

উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে কথাগুলো বলে ফেলে হীরুবাবু অপ্রতিভ হলেন, হাত জোড় ক'রে নেপেনবাবুকে বললেন, 'অপরাধ নিলেন না তো? পাগল-ছাগল ভেবে মাপ করবেন। তবে তাও বলি, আমি নিজে য়্যাকটার যেমনই হই, দেখেছি যে অনেক। তিনকড়ি কি বড় গোলাপকে অবিশ্যি দেখি নি, দেখেছি বললে মিছে কথা বলা হবে। বিনোদিনী গঙ্গামণি—এ সব নামই শোনা। বিনোদিনীকে একদিন অবিশ্যি দেখেছি, রাজা-বাগানে বাড়ির রোয়াকে নাতির পায়ে আঁচল বেঁধে বসে থাকতে—এদান্তে শ্বেতী হয়েছিল তো, ওর পাকপাড়ার বাবুরও ঐ রোগ ছিল। নরীকেও দেখেছি বাল্যকালে—আহা অমন গলা হবে না কারও—কিন্তু তারা, কুসী মানে কুসুমকুমারী, প্রেকাশমণি—এদের বেশ জ্ঞানেই দেখেছি, চারি-নীরি-ব্ল্যাকিকে তো দেখেছিই, নেড়ি মানে সরোজিনী ওকে অবিশ্যি দেখা হয় নি—সে-ই বোধ হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে প্রেথম হেলেন

হয়েছিল—প্রেভা নীহার তো সেদিনের কথা। বড় সুশীলাকে দেখি নি—একালের বড় ছোট দুই সুশীলাকেই দেখিছি, কেষ্টভামিনী ফিরোজা—এদের কাছে থেকেই দেখিছি, কথা কয়েছি। এদিকে যারা নাম করবে তাদের চোখে মুখে অন্য রকম আলো থাকবে, নিপাট ভালো মানুষের মতো চাউনি হলে চলবে না। তোমার মুখে সে জেল্লা নেই ভাই, যাই বলো না কেন। বুঝছি, বাধ্য হয়ে তুমি এ কাজ করছ, অনিচ্ছেয়। হাততালির নেশা তোমার নেই।'

সহজে এ বক্তৃতা থামবে না বুঝে নেপেনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'চা খাবেন একটু? করতে বলব?'

'এই দেখুন, মুশকিলে ফেললেন।...ও জিনিসটায় বড্ড লোভ আমার। অবিশ্যি নাতিরা তার জন্যে যে খুব ব্যাজার হয়, তা হয় না। দিনে রাতে পাঁচ-ছ' কাপ জোটে; তবে যে এককালে বিশ-পঁচিশ কাপ খেয়েছে তার কাছে এ আর কী বলুন। কিন্তু আমি ভাবছি কি, লাইনের লোক যখন পেয়েছি, অমন হয়ত ফি-দিনই দিদির কাছে আসব—এসব লাইনের কথা শোনা দরকার। আমি মরে গেলে কেউ বলার থাকবে না আর। এত এস্‌টক্ কারুর নেই, কার বা গরজ মনে ক'রে রাখবে। তখন আবার মনে করবেন না তো বুড়োটা চায়ের লোভেই রোজ আসে? মনে করলে অবিশ্যি যে খুব অন্যায় করবেন তাও নয়—আমি সত্যিই যাকে বলে "পপার"—রাস্তার ভিখিরী, তাই। আমার কিছুই নেই, এক পয়সাও না। নিহাত নাতিরা সম্পর্কটা ফেলে দেয় নি, তাই মাথার ওপর একটা ছাদ আর দু'মুঠো দু'বেলা খেতে পাচ্ছি!'

নীলা উঠে পড়ে বলল, 'আপনি বসুন দাদামশাই, আমি চা ক'রে আনছি। আপনি রোজ এলে খুশীই হবো, চাও এক কাপ দিতে পারব অন্ততঃ!'

তিন

বেঁচে গেল দু'জনেই। দু'টি পরিবারই বলা উচিত বোধহয়।

নেপেনবাবুরা পরোক্ষ ভাবে 'একঘরে' হয়েই ছিলেন। বিশেষ যেদিন বিমলবাবুর প্রকাণ্ড বিদেশী গাড়িখানা সন্ধ্যায় এসে দাঁড়াতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই হাউসিং এস্টেটের এদিকটার অধিবাসীরা এদের সম্বন্ধে একটু উদাসীন হয়ে পড়েছেন।

যাঁরা বলেন এখন কোন সামাজিক শাসন নেই তাঁরা একটু ভুল করেন। আগের মতো। ধোপা-নাপিত বন্ধ করার উপায় নেই—অন্তত শহরে নেই—বলেই করা যায় না, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—শাসন একটা ঠিকই আছে। আর বোধহয় কিছুদিন সেটা থাকবেও।

দেখা হলে বা চোখোচোখি হলে যে কথা বলেন না তা নয়, নেপেন-বাবু কথা কইলে ভদ্রভাবেই উত্তর দেন, সেক্ষেত্রে ও-পক্ষ থেকে কুশল প্রশ্নেও ভুল হয় না—তবু কোথায় যে একটা আপাত-অদৃশ্য পাঁচিল পড়েছে তা এঁরা সকলেই অনুভব করেন। মহিলারা এক ব্লক বা এক ফ্ল্যাট থেকে অন্য ব্লকে অন্য ফ্ল্যাটে বেড়াতে যান—এটা স্বাভাবিক নিয়মেই চলে আসছে। ওরই মধ্যে যেখানে চা ও পানের ব্যবস্থা ভাল সেখানে হয়ত বেশি যান—তবে চক্রাকারে সব ফ্ল্যাটের বাসিন্দাই অপর ফ্ল্যাটে যাওয়া আসা করেন।

এঁদের ফ্যাটেও দুপুর বা বিকেলের দিকে আসতেন অনেকে। এখন আর কেউ আসেন না, পথে ঘাটে দেখা হলে নীলার মার অনুযোগের উত্তরে সময়াভাবের অজুহাত দেন। তিনি অন্য ফ্ল্যাটে গেলে 'আসুন আসুন' বলে অভ্যর্থনার ত্রুটি ঘটে না, কিন্তু তার পরে উপস্থিত অন্যরা যেন তাঁর অস্তিত্বই ভুলে যান, তাঁকে বাদ দিয়ে বাকী সবাই আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কখনও যদি বা উনি ওপরপড়া হয়ে আলোচনার

মাঝখানে কথা বলতে যান, সংক্ষেপে একটা মন্তব্য ক'রে আবার নিজে-দের কথায় ফিরে যান তাঁরা, ওঁর দিকে বস্তুতঃ পিছন ফিরে থাকেন। কাজেই নীলার মা বাধ্য হয়েই যাওয়া বন্ধ করেছেন, কাউকে এ ফ্ল্যাটে আশাও করেন না।

হীরুবাবুরও তাই। উনি বরং অনেকদিন আগেই নিজেকে কোটর-গত করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু একটা লোক, বিশেষ ওঁর মতো লোক কথা না বলে কতদিন থাকতে পারে! অবশ্য একেবারে যে কথা বলতে পারেন না তা নয়—কিন্তু উনি যা বলতে চান, বিগত দিনের জীবন-অভিজ্ঞতা—তাতে দেবুদের কোন আগ্রহ নেই। ওরা সে যুগের থিয়েটার দেখে নি—ওদের কাছে শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরী কি দুর্গাদাস—ক'টা নাম মাত্র। এখনকার থিয়েটারও দেখে না ওরা, অত পয়সা নেই। সুযোগ সুবিধা হলে মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখে।

ঝি তো এসব জানেই না। তবু হীরুবাবু তাকে ধরেই বোঝাতে যান বাংলা স্টেজের সেই সব বিগত গৌরবময় দিনের কথা। সে হেসে পাশ কাটায়। অর্থাৎ পাগল ভাবে। আসলে এসব বলতে না পেয়েই যে পাগল হতে বসেছেন—এইটেই কাউকে বোঝাতে পারেন না হীরু-বাবু।

এই মেয়েটিকে পেয়ে বেঁচে গেলেন উনি। নীলাও যে ঠিক বোঝে তা নয়—এসব ওর কাছে হিব্রু বা গ্রীকের মতো দুর্বোধ্য না হোক, হিন্দী ভাষার মতোই অর্ধবোধ্য। তবু সে স্থির হয়ে বসে শোনে। হীরু বাবু সে সময়ের গল্প বলতে বলতে যেন সেই বিগত যুগেই চলে যান, উৎসাহের দীপ্তিতে ওঁর শীর্ণ বিবিধ-অত্যাচার-চিহ্নিত মুখের চেহারাও পাল্‌টে যায়। সত্যিই মনে হয়, ভদ্রলোকের বয়সটাও কমে গেছে, দৈহিক অর্থেও সে যুগে ফিরে গেছেন।

নীলা এই বর্ণান্তর-রূপান্তরটাই দেখে চেয়ে চেয়ে, আর ওঁর একই গল্প বহুবার শুনতে শুনতে সেই যুগের হাওয়া পরিবেশ বুঝতে চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম শুনত বুড়ো মানুষটাকে খুশী করতেই, পরে একটু

একটু ক'রে নিজেরও নেশা লাগে।

নেপেনবাবুর এসব একঘেয়ে গল্প ভাল লাগে না। থিয়েটারের সে যুগ চলে গেছে—এখন সে সব 'ফ্যান'ও আর নেই। এখন লোকে যা পায় তাই দেখে। নেপেনবাবু তখনও বিশেষ দেখেন নি, এখনও দেখেন না। এসব তথ্য জানার কোন আগ্রহই নেই ওঁর। তবু একটা অন্য ফ্ল্যাটের লোক আসে, গল্প করে—তাতেই মনে হয় তাঁরা সম্পূর্ণ 'এক-ঘরে' হয়ে নেই—এইটুকুই লাভ ভাবেন।

আর মেয়েটা একটু ভুলে থাকে এই সব আবোল তাবোল বকুনিতে—তাতেও কিছু উপকার হয়। ওর চেহারা যে খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে, দেহের ওপর দিয়ে যত ঝড় যাচ্ছে তার আঘাত আর অপমান যে মনকেও কম বিপর্যস্ত করছে না—এটুকু বোঝার মতো মনুষ্যত্ব এখনও বুঝি আছে। বিমলবাবুও এটা লক্ষ্য ক'রে নানা ধরনের টনিক এনে দিয়েছেন—কিন্তু নীলা তা খায় না। একদিন দু'দিন নেপেনবাবু অনু-যোগ করতে গিছলেন কিন্তু নীলা এমন হতাশ এমন করুণ ভাবে ওঁর দিকে চেয়ে থাকে—মাথা আপনিই হেঁট হয়ে যায়, পীড়াপীড়ি করতে পারেন না।

তবু, হীরুবাবু এলে মেয়েটার মন একটু ভাল থাকে। অন্তত অন্যমনস্ক থাকে, তা বুঝেও এক একদিন সতর্ক ক'রে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন বৈকি। বলেন, 'ও বুড়োর সব কথা ষোল আনা সত্যি এমন যেন মনে করিস নি। ওর ভীমরতি মতো হয়েছে—দেখিস না কোন দিনই ও মহলে কলকে পায় নি, শুধু ঘুরেছে আর পড়ে থেকেছে—নিজের স্বাস্থ্য আর আখের নষ্ট করেছে। কে ওর গলা জড়িয়ে বলতে গেছে এসব? লোকের মুখে শুনেছে, তাও হয়ত বাজে লোকের মুখে। ওকে কে বড় য়্যাকটর বা য়্যাকট্রেস পাত্তা দিয়েছে যে তাদের মুখে শুনবে! কাজেই যারা বলেছে তারা কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে বলেছে তা কে জানে? সত্যি হলেও হয়ত আট আনা সত্যির ওপর বাকী আট আনার রঙ চড়ানো। তাও সে অত আগে

শুনেছে—সব কি মনে আছে ওর। যা অবস্থা, কিছুই তো মনে রাখতে পারে না।'

ক্লান্ত সুরে নীলা বলে, 'জানি বাবা। কিন্তু সত্যি না হলেই বা আমার কি ক্ষতি! আমি তো শুনছি কতকগুলো গল্প—ভাল লাগছে, এইটুকুই লাভ! আমি তো আর বই লিখতে যাচ্ছি না যে মিথ্যে থেকে সত্যি-টুকু ছেঁকে বার করতে হবে। আর লিখলেই বা কি, সেদিন এক ভদ্র-লোক, কোথাকার অধ্যাপক যেন, বলছিলেন, অনেক থিসিস লেখা হচ্ছে আজকাল, তাতেও ঝুড়ি ঝুড়ি ভুল। আত্মজীবনী যা লেখা হয় তা পুরো উপন্যাস এক একখানি।'

হীরুবাবু কিন্তু এসব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধার ধারেন না। তিনি যে কথা বলতে পারছেন এক জায়গায়—এ-ই যথেষ্ট, তায় ওঁর নিজের 'লাইনের' গল্প—এক এক সময় বৃদ্ধর মনে হয়, দীর্ঘজীবনব্যাপী ব্যর্থতা ও হতাশা, দুঃখ ও দারিদ্র্য ভোগ করার পর ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন—মৃত্যুর মুখে পৌঁছে একটু সুখের মুখ দেখালেন। একটি সুশ্রী ভদ্র তরুণী মেয়ে মন দিয়ে তাঁর এইসব গল্প শোনে—বারবার নিজে চা ক'রে খাওয়ায়—এই তো স্বর্গসুখ!

'য়্যামেচার! য়্যামেচারই কি যে সে! সেকালে থাকোবাবু বলে একজন ছিলেন—প্ল্যাকার্ডে লেখা হত "এন. ব্যানার্জী (য়্যামেচার)"। যেমন চেহারা তেমনি য়্যাকটিং-এর গলা। পয়সাও ছিল অঢেল, দিল্‌টাও ছিল সেই মাপের। একদিন রাত্তিরে বৈঠকখানায় আড্ডা জমেছে, বাইরে তুমুল বৃষ্টি—এক ঘর লোক ইয়ারবক্সী মোসায়েব। তারা বললে, "খিচুড়ি খাবো থাকোবাবু, খিচুড়ি আর কৈ মাছ ভাজা।" বোঝ ব্যাপারটা, তখন রাত বারোটা। থাকোবাবু বললেন, "তাতে কি হয়েছে, খাবে।" তখনই লোক গেল নতুন বাজারে, মেছোদের জাগিয়ে তুলে কৈ মাছ আনা হ'ল, সেই অত রাত্তিরে ভুনি খিচুড়ি রান্না হ'ল, রাত আড়াইটের সময় সব হৈ-হৈ ক'রে খেলে। ঐসব লোক এখন থাকলে কি আমার এই অবস্থা হয়!...য়্যামেচার আরও অনেক ছিল, পালিত বলে ছিল একজন।

আবার যারা সরকারী চাকরি করত—তাদের সকলেরই নামের পাশে ব্র্যাকেটে য়্যাঃ লিখতে হত—নইলে চাকরি যাবে। তারা অবিশ্যি মাইনে নিত এখানেও, অন্য খাতে লিখে দেওয়া হত।

'তবে কি জানিস দিদি, বড় য়্যাক্‌টার কি য়্যাক্‌ট্রেস হতে হলে সাধনা চাই, নিজের চেষ্টা আগ্রহ, আবার ঈশ্বরদত্ত এলেমও চাই। গিরীশ ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তফী, অমর্ত মিত্তির—এরা সব এই কেলাসের লোক, ভগবানের কাছ থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছিল, সাধনাও ক'রে গেছে জীবন-ভর। দানীবাবু-টাবু এরা—গিরীশ ঘোষের ছেলে, বড় পার্ট এমনিই পেতে পারত দানীবাবু—কিন্তু তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকেছে? বাপ তো গড়ে দেছলই, যখন যেখানে গেছে রিয়েস্তাল মাস্টারকে বলেছে, একটু দেখিয়ে-টেখিয়ে দিন। তিনকড়িকে পাখি পড়ানোর মতো করে শিখিয়েছিলেন গিরীশবাবু, সব রকমের পার্ট লিখেছেন ওর জন্যে, যাতে একপেশে হয়ে না থাকে। তারা এতটুকু মেয়ে তাকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাটতেন অমর্ত মিত্তির, শুধু একা ওকে দিয়ে রিয়েস্তাল দিইয়েছিলেন দোর বন্ধ ক'রে। ষোল বছর বয়সে শৈবলিনীর পার্ট ক'রে এমন জ্বালিয়ে দিলে তারা, কোন বড় য়্যাক্‌ট্রেস তারপর বহুকাল পর্যন্ত আর করতে সাহস করত না। তাতেই তো অমর দত্ত ওকে নিয়ে চলে গিছলেন, বাগমারীর বাগানে গিয়ে রেখেছিলেন। খুব থিয়েটারের নেশা তো, বড়-লোকের ছেলে, রেলির বাড়ির মুচ্ছুদ্দী ছিলেন ওঁর বাপ শুনেছি—ভাব-লেন এমনি একটা জুড়ি থাকলে আর আমায় পায় কে? তা ও জুড়ি অবিশ্যি রইল না। ওঁর জুড়ি হ'ল গে কুসী, কুসুমকুমারী। সে-ই ছিল দীর্ঘকাল, অনেক খেটেছে ওঁর জন্যে। খুব শক্তি ছিল দিদি, তা বলব। গিরীশবাবু বলতেন, "ও আমার শ্রুতিধর," একবার যে কথা শুনবে তা অমনি মাথায় পেরেক মেরে গেঁথে গেল। একবার নাকি বাইরে কোথায় বায়নায় গেছে পার্টি—'জনা' প্লে হবে, "সাট" যায় নি, নিয়ে যেতে ভুল হয়ে গেছে। সাট মানে বড় বড় ক'রে হাতে লেখা নাটকের কপি—ঠিক যেটুকু প্লে হবে সেইটুকু—এই সাট দেখেই প্রম্‌প্‌টাররা প্রম্‌প্‌ট করে,

নইলে ছাপা বই দেখে করলে গোলমাল হয়ে যায়। সেই জিনিস যায় নি—সব্বনাশ! কী হবে তখন, সবাই তো মাথায় হাত দিয়ে বসল। কুসুমও গেছল সঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণ সাজবে, গিরীশবাবু বললেন, "তুই বাবা একটু কাজ চালিয়ে দে, তুই-ই প্রম্‌প্‌ট করে যা।" তা তাই করলে কুসী, মেমারি থেকে গোটা নাটকটা প্রম্‌প্‌ট করে গেল।

'ঐ এক আশ্চর্য মেয়ে ছিল ভাই। শরীর ছিল মাখমের মতো। যখন নাচত মনে হত হাড়গোড় কিছু নেই। আলিবাবার অত সাকসেস ঐ দু'জনের জন্যে—নেপা বোস আবদালা আর কুসী মার্জিনা। বুড়ো বয়সে—সে কত হবে ১৯২৬।২৭ সাল, ঠিক মনে নেই—য়্যালফ্রেড স্টেজে তখন মিত্র থিয়েটার—ওরা ধুম ক'রে বিজ্ঞাপন করলে আলিবাবা, ঐ জুটিতে। ওঃ, সে কি ভিড় রে ভাই, ত্রিশ টাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে কত লোক। সেকালে—যখন আড়াই টাকা পৌনে তিন টাকায় এক মণ চাল মিলত কলকেতায়। তবে বুড়ো বয়েসটা ওর বড় খারাপ গেছে। এই এক বৃত্তি ভাই, দেহ গেলেই সব গেল। আরও ওর মুশকিল কি জানিস—ছুঁড়িও রইল না, বুড়ীও হতে পারল না। মুখখানায় কচি কচি ভাব একটা রয়ে গেল—তাই বলে তো আর হিরোইন সাজানো যায় না। সিনেমার যুগ এসে কত লোকের নতুন ক'রে অন্ন হ'ল—ওর হ'ল না। পান্না বলে নব্বুই বছরে পার্ট পেলে—কিন্তু ওকে না দেওয়া যায় বুড়ীর পার্ট না দেওয়া যায় হিরোইনের। ঐ স্টেজেই যতদিন পেরেছে কাজ করেছে, স্টার থিয়েটারে মন্ত্রশক্তিতে নামিয়ে ছিল দিনকতক—তারপর একটা সময় এল, কেউ কাজ দেয় না। একটা বাড়ি ছিল দর্জি-পাড়ায়, তেমনি বেরৎ সংসার। শেষের দিকে হেমেনদার মুখে শুনেছি, মধ্যে মধ্যে এসে দু' টাকা পাঁচ টাকা সাহায্য নিয়ে যেত বাজার খরচ চলে না বলে। অত নাম ডাক যার! আরও একটা গল্প শুনেছি, সত্যি মিথ্যে জানি নে দিদি, আমার তো বিশ্বাস হয় না, কে দিব্যি এক লাগ-সই লচ্ছেদার গল্প বানিয়েছে হয়ত। কুসুম নাকি মধ্যে মধ্যে—যখন খুব অভাবটা যাচ্ছে—মাইনের দিন হলে নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিওর সামনে

দাঁড়িয়ে থাকত—কিছু কিছু সাহায্যের জন্যে। যেত কিন্তু মুখটা সম্পূর্ণ ঘোমটায় ঢেকে। এক কালে অত রবরবা—অভিনেত্রী-কুলরানী উপাধি দিয়ে প্ল্যাকার্ড পড়ত—নাচে-গানে অভিনয়ে সব রকম পার্টে সমান ক্ষমতা, তারা তিনকড়ির সঙ্গে এক সারিতে নাম করত এক কালে—সেই ইজ্জতটা বাঁচাতেই এক গলা ঘোমটা দেওয়া।

'তখন নিউ থিয়েটার্সের খুব বোলবোলাও, সারা ভারত সম্মানের চোখে দেখত, ঠিক দিনটিতে মাইনে হত একমাত্র বোধহয় ওখানেই, সরকারী আপিসের মতো। কাজেই দু' টাকা চার টাকা অনেকেই দিত। আর মুখ না দেখা যাক—ওর গলার আওয়াজ, বলার ভঙ্গীতে সম্ভ্রান্ত কোন মহিলা দুঃখে পড়ে হাত পাততে এসেছে এটা বোঝা যেত। একদিন হ'ল কি, পড়বি তো পড়্ বড়ুয়া সাহেবের সামনে একেবারে। সবে মাইনে নিয়ে বেরোচ্ছেন, মোটা মাইনে পেতেন, বোধহয় হাজার দেড়েক টাকা হবে—উনিও তো তেমনি খরচে, রাজার ছেলে, হাত মুঠো করতে জানতেন না, সেদিন নাকি বাড়িতে এক পয়সাও ছিল না, উনি গেলে তবে বাজার হবে। তা হোক, সাহায্য চাইছে, মেয়েছেলে বলেছে "বাবা, আমাকে কিছু সাহায্য করুন, আপনি কিছু বেশি ক'রেই দিন।" উনি সঙ্গে সঙ্গেই বুক পকেটে হাত দিয়েছেন—কিন্তু কি গেরো, অমন-ধারা কথা উনি কখনও বলতেন না, মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, একটু বাঁকা সুরেই, "সাহায্য চাইতে হচ্ছে যখন—তখন অত আর ঘোমটা কেন মুখে! চাইতে লজ্জা নেই, মুখ দেখাতেই যত লজ্জা!" উত্তর এল, তেমনি মিষ্টি শান্ত গলায়, "আমার লজ্জার জন্যে মুখ ঢাকি নি বাবা, আপনি আপনারা লজ্জা পাবেন বলে মুখ ঢেকেছি।" বলতে বলতেই ঘোমটা খুলে ফেলল। বড়ুয়া সাহেব তো স্তম্ভিত, চোখকেও বিশ্বাস হচ্ছে না যেন। প্রায় দু' তিন মিনিট চেয়ে থেকে তিনি মাইনের সমস্ত টাকাটা বার ক'রে ওর হাতে দিয়ে বললেন, "আর কোন দিন যেন না দেখি এখানে—তাহলে আমি গুলি ক'রে মারব।"

'জানি নে, তবে হয়। অমন হয়। শিল্পী তো—টাকা রাখতে পারে

না। তারার অমনি ছুগ্‌গতি দেখেছি—তবু তো সে ভাতুড়ির থিয়েটারেও বছরে দশ হাজার টাকা নিয়ে প্লে ক'রে গেছে! এক তিনকড়ি আর অহীন্দ্র চৌধুরী ছাড়া কেউ টাকা রাখতে পারে নি। আর তাই বা বলব কি, ক্রোড়পতি য়্যাটর্নির নাতকে হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে এসে হাত পাততে দেখেছি।'

আবার কোন দিন হয়ত এসেই চা করতে বলেন। চেয়ার পছন্দ নয়, মেঝেতেই বসেন গুছিয়ে। বিছানায় যে এই নোংরা লুঙ্গী পরে বসা উচিত নয়, তা বোঝেন, বসতে বললেও বসেন না। নেপেনবাবু ওপরে বসেন ওঁর অনুমতি নিয়ে, নীলা ওঁর সামনেই মেঝেতে বসে, ভক্তিমতী শ্রোতার কথকতা শোনার মতো।

চা খেয়ে হয়ত শুরু করলেন শিক্ষা ও সাধনার কথা।

'সাধনা কি কম দিন করেছে ঐ এক একজন নামকরা য়্যাক্‌টার য়্যাক্‌ট্রেস! না এর শিক্ষারই শেষ আছে। অত বড় যে য়্যাক্‌টার দানীবাবু—ভাতুড়ি যতই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করুন—মরার আগেও ছ্যাখো ছুর্গাশংকর, ঐ অনুরূপা দেবীর বাগদত্তা না মহানিশা কি বই বাপু মনেও থাকে না—তাতে শ্যামাকান্ত করেছে, লোকে অবাক্ হয়ে গেছে ক্ষমতা দেখে। বলবে যে গিরীশবাবুর শিক্ষে—এসব পার্ট, কি ধরো ভাস্কর পণ্ডিত, এসব তো আর জি. সি. ঘোষ শিখিয়ে যায় নি! তাকে যাঁরা উড়িয়ে দিতেন মুখ্‌খু আপিংখোর বলে—তাঁরাই বুড়ো বয়সে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আমার মতো অবস্থা, বাড়ি বসে হাপু গেলা। একজন তো কোথাও পাত্তা না পেয়ে কলেজ স্ট্রীটের বইয়ের দোকানে বসে আমার মতোই আগের দিনের জাবর কেটেছেন। দানী-বাবু তাদের নাকের সামনে তিন তুড়ি মেরে নাম যশ থাকতে থাকতে স্বগ্‌গে চলে গেল। কেন জানিস, ওদের মতো হামবড়া, সব শিখে নিয়েছি—এ ভাব ছিল না। মরার আগেও দেখেছি, প্লের ছ' তিন ঘণ্টা আগে থেকে কথাবার্তা বন্ধ ক'রে দিতেন, কেউ কিছু জিগ্যেস করলে হুঁ-

হুঁ। উত্তর দিতেন, থিয়েটারে এসেও রং-করা সাজা হয়ে গেলে এক কোণে চুপ ক'রে বসে থাকতেন—ওঁর সিন এলে ঠাকুরের ছবিতে পেন্নাম করে বেরিয়ে প্লে ক'রে আবার তেমনি গুম হয়ে বসে থাকতেন—যতক্ষণ না পালা শেষ হয়। মনে মনে সেই ভাবটা ধরে রাখতেন আর কি!

'ক্ষমতার আর মনের জোর কি যে-সে ছিল। তবে বলি শোন্, একবার এই শেষের দিকে কি হয়েছিল জানিস দিদি, কে একজন পুরনো লোক—মানে এই লাইনের লোক খেতে পাচ্ছে না—গিয়ে ধরল, সে একটা বেনিফিট নাইটের ব্যবস্থা করেছে—সাহায্য রজনী যাকে বলে—ওঁকে নামতে হবে। বলিদান নাটক, করুণাময় করবেন অপরেশবাবু, রাজী হয়েছেন—দানীবাবুকে দুলালচাঁদ করতে হবে। বাকী সব যেমন তেমন—মিনার্ভার ভাঙা হাটের স্টাফ।

'দানীবাবুর এই পার্টের খুব নাম শুনেছি, দেখা হয় নি। পাস দেবে না, মানে যার বেনিফিট তাকে আমি চিনি না। নিজের পকেট তো সর্বদা সন্ন্যাসীর পকেট। এক চেনা লোককে গিয়ে ধরলুম, চলো দেখে আসি। তাকে আমি অনেকবার বিনি পয়সায় দেখিয়েছি, সে রাজী হয়ে গেল। বলিদান সে আমলের কন্যাদায় নিয়ে লেখা, খুব জমাটি বই, বড় দুঃখেরও। এক বড়লোক য়্যাটর্নির নেশাখোর কুঁজো মুখ্খু ছেলে হ'ল দুলালচাঁদ—তার ইচ্ছে করুণাময়ের একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করবে, রূপচাঁদ সেই বুঝে জাল ফেলেছে, প্যাঁচে পড়ে যাতে করুণাময় ঐ পাঁকের মধ্যে মেয়েটাকে ফেলে দেয়। সেই ছেলের পার্ট—নেশাখোর, বোকা মুখ্খু পাঁঠা একেবারে—দানীবাবু করতেন, তখন সবাই জানত গিরীশবাবু যাকে তৈরি করবেন তার জন্যে সব রকম পার্ট লিখতেন। দুলালচাঁদের একটা গান, একটা নাচও আছে বইতে।

আমার মুরুব্বি তো ভিড় বেশি দেখে যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন তিন টাকার টিকেট কিনেছে দু'খানা—গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, দানী-বাবু এসে গাড়ি থেকে নামলেন ও-পাশের ফটকের কাছে। উনি এদান্তে তো মোটে চোখে দেখতে পেতেন না, আর তেমনি বিরাট চেহারা, থপ-

থপে হয়ে গিছলেন, একবার বসলে দু'জনে ধরে তুলতে হত। সেদিনও দু' তিনজন লোক গাড়ি থেকে নামিয়ে ধরে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল, হাতড়ে হাতড়ে গেলেন অন্ধ পঙ্গুর মতোই। আমার বন্ধু তো আমার ওপর রেগে আগুন, বলে, "এই দেখাতে নিয়ে এলে! চোখে দেখে না, জলহস্তীর মতো চেহারা, এ কী করবে দুলালচাঁদ!" আমারও যে সে সন্দেহ না হয়েছিল তা নয়, তবু আমাকে মুখ-সাপোর্টটা রাখতে হবে তো, আমি বললুম, "ছাখোই না, কী খেল দেখায় ঐ হিপোপটেমাস"!

'তা দেখাল, বুঝলি দিদি, একেবারে গণপতি চক্কোত্তির ম্যাজিক। ঐ কানা থপথপে অথব্ব হাতি নেচে গেয়ে, তাতে এনকোর নিয়ে—এন-কোর পড়লে আবার ফিরে এসে সেই গান গাইতে হয়, এই নিয়ম—আবার পুরোটা গেয়ে মাত ক'রে দিয়ে চলে গেল। ছোকরাদের মতোই নাচতে নাচতে এল, শেষ হলে তেমনি নাচতে নাচতেই ভেতরে চলে গেল। এই হ'ল সাধনার সিদ্ধি। তারাসুন্দরী একবার বলেছেল আমার সামনে কোন এক কাগজের সম্পাদককে, 'বুঝলেন বাবা, আমাদের সিদ্ধি হয়ে গেছে, মরার পর যখন চিতেয় চাপাবে তখনও যদি মড়াটাকে এনে স্টেজে দাঁড় করিয়ে দেন, রিজিয়া প্লে ক'রে চলে যাবো।'

নীলা বোধহয় অনেকক্ষণ ধরেই চেষ্টা করছিল কিছু বলবার জন্যে, হীরুবাবুর দীর্ঘ বক্তৃতা থামাবার কোন সুযোগ পায় নি। এখন আস্তে আস্তে বলল, 'এসব আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ নেই দাদা,'—হীরুবাবুই বলে দিয়েছেন দাদামশাইকে সংক্ষিপ্ত করে দাদা বলতে, বলেন, 'আর ঐ এক হয়েছে আজকাল—দাদু, পথে ঘাটে যেখানে সেখানে সকলকে দাদু বলা, শুনলে পা থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে যায়।' নীলা বলে, 'আমার সে বয়সও নেই, সে ঝোঁকও নেই। সামনে কোন ভবিষ্যৎও নেই। কে-ই বা শেখাবে তেমন ক'রে, শিখেই বা কি করব? এক এক জায়গায় এক এক দল, এক এক পালা; এদের কারো কোন গোড়া নেই, শেকড় কোন দিনই নামবে না মাটিতে। যা দু' এক পুরনো দল আছে, মাঝে মাঝে অভিনয় করে, তাদেরও সব পুরনো বাঁধা লোক, সেখানে ঢোকা

মুশকিল। আর তারাও শুনেছি সামান্য সামান্য পায় অভিনয়ের দিন, তাতে আমার চলবে না। কার জন্যে কিসের আশায় প্রাণপাত ক'রে শিখব বলুন। হঠাৎ হঠাৎ যেসব দল গড়ে ওঠে মধ্যে মধ্যে, একখানা পালা নামায়—তাতে যে মেয়েরা অভিনয় করে তাদের কারও নাম শোনেন, কোন নতুন মেয়েকে নাম করতে শুনেছেন? একটানা একটা বড় থিয়েটারে থাকলে, নাটকের পর নাটক করলে আপনি যাদের ভাল বলছেন তাদের মতো নাম হতে পারে। নাম হয় একটু একটু ক'রেই, তাই না?'

হীরুবাবু বলেন, 'হয় ভাই। একখানা বইয়ে পাট করেও নাম হয়। হয়েছে। তারা রাতারাতি শৈবলিনী ক'রে বিখ্যাত হয়ে গেছল, তিনকড়ি বিবাহ বিভ্রাটে ঝিয়ের পার্ট ক'রে। তবে এটা সত্যি, সে থিয়েটারও নেই, সে মাস্টারও নেই, সে অডিয়েন্সও নেই।'

নীলা গলায় একটু জোরই দেয় ওঁকে থামাতে, 'শুনেছি যাত্রায় আজকাল খুব নাম হচ্ছে, পয়সাও বেশি, কে আমাকে সেখানে পরিচয় করিয়ে দেবে বলুন? এই যে হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা সব এক-নাট্কে দল, সেখানেই তো ঢুকতে পারলুম না আজ অব্দি। তবু পঞ্চাশ-ষাট নাইট একটানা একটা বইতে নামতে পারলে হয়ত লোকে লক্ষ্য করে। না দাদা, সত্যি বলছি আর কোন আশাও নেই, কোন ইচ্ছেও নেই। শুধু ভাবি কেমন ক'রে এ থেকে রেহাই পাবো। আত্মহত্যা করতে পারি—কেবল মায়ের মুখ চেয়েই—। প্রথম যখন এসেছিলুম, তখনও এ পথ ভাল লাগে নি, তবু কিছু আশা ছিল, কিন্তু এসে পর্যন্ত অপমান আর লাঞ্ছনা সইছি, অথচ ভবিষ্যৎ বলতে আর কিছু নেই কোথাও, আশা এত দূরে চলে গেছে যে তার চিহ্নও পাই নে কোথাও।'

বলতে বলতেই ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলে নীলা।

তখন নেপেনবাবু ছিলেন না, বাজারে গিছলেন, উনি বেলাতেই বাজার করেন, মা রান্না করছেন, মাঝের দোর আধ-ভেজানো, বুড়োর এই একঘেয়ে গল্পে তিনি কানও দেন না। বোধ হয় সেই জন্যেই আজ মন খুলতে পেরেছে নীলা।

এই প্রথম চুপ ক'রে গেলেন হীরুবাবু, নীলার চোখের জল আর হতাশ কণ্ঠস্বরেই বোধ হয়। তাঁর ছোট ছোট কুতকুতে চোখ মেলে তাকালেন, নীলার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'কিছু মনে করিস নি ভাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। আমি তো ঐ নীচে জানলার ধারেই বসে থাকি দিনরাত, অনেক কিছুই চোখে পড়ে। আগে যেমন তোর ডাক আসত, মধ্যে মধ্যেই লোক আসত. গাড়ি আসত, তোকে নিয়ে যেতে, পৌঁছে দিতে—ট্যাক্সিও আনত কেউ কেউ—এখন তো আর বিশেষ দেখি না। কদাচিৎ কোন দিন. মাসে হয়ত একদিন—কেন বল তো ? ডাকে না কেউ, না অন্য কোন বাধা এসেছে ?'

নীলা মাথা হেঁট ক'রে মেঝের একটা গর্ত খুঁটতে খুঁটতে বলে, 'না হয়ত মাসে একটা। মাসে দু'টো হয়েছিল তিন মাস আগে। বিমলবাবুর বড় বেশী বাছবিচার। বলেন, "চারশো টাকার কম যাবে না। কেন যাবে ? তুমি ছোট হবে কেন ? আমি কি তোমার কোন অভাব রেখেছি ?" উনি এমন করেছেন, আজকাল ক্লাবের থেকে কোন লোক কি দালাল কেউ আমার কাছে আর আসে না, ওঁর কাছেই যায়। ক্লাব ওঁর জানা কি পছন্দসই না হলে যেতে দেন না। রেট-টেটও উনিই ঠিক করেন।'

হীরুবাবু যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, 'কিন্তু এ তো—এমন করলে যে বাজারটাই চলে যাবে ভাই, পরে আর কেউ আসবে না, বলবে ওর বড় গ্যাদা। ওকে অত টাকা দিয়ে আনব কেন, কী এমন আহা মরি য়্যাক্-ট্রেস ! ক্রেমে যে একেবারে কাজের বার হয়ে যাবি।'

ব্যাকুল হয়ে ওঠে যেন নীলাও, বলে, 'সবই বুঝি দাদা, কিন্তু কি করব, এ বেড়াজাল থেকে কি ক'রে বেরোব সেইটেই যে বুঝে পাই নে। মাসে দু'টো ক'রে হলে পাঁচশো টাকা বড় জোর—তাতে তো সংসার চলে না। এখন এমন হয়েছে, বিমলবাবুই যোগান যখন যা দরকার হয়। উনিই এ বাড়িতে কর্তা হয়ে বসেছেন বলতে গেলে। বাবার

হাতটাও হয়ে গেছে বড়। আগেও ছিল, অভাবের দায়ে দিনকতক গুটিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন, এখন আবার বাড়িয়ে ফেলেছেন। ভাল জিনিস খেতে চান, ভাল জামাকাপড়—ভাইটাও হয়েছে তেমনি অবুঝ, নেশার পয়সা না পেলে মাকে মারধোর করে—বাড়ির জিনিস নিয়ে গিয়ে বেচে আসে। হাজার টাকার ওপর খরচা হয়ে যায় এক এক মাসে। এটা তো প্রায় সবই বিমলবাবু টানছেন।'

'কিন্তু এ তো ভাল নয়। কিছুতে এ হতে দেওয়া উচিত নয়। না না, এ বড্ড মন্দ কথা হ'ল যে!' হীরুবাবু বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, 'আমি আগেই—নিত্যি ঐ এক গাড়ি এসে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে দেখেই সন্দ করেছিলুম। লোকটার মতলব খুব খারাপ—বুঝতে পারছি। অন্যদিকের রোজগারের পথ বন্ধ করতে চায়, তোকে বাঁধা রাঁড় রাখবে এই ইচ্ছে। রেখেছেও তো তাই—তুই কিছু মনে করিস নি—কথাটা কি তাই দাঁড়াচ্ছে না? কিন্তু তাই বলে আসল রোজগারের পথটা বন্ধ করবে কেন? ঐ যে তিনকড়ি, অত বড় বাবুর কাছে ছেল, ঠাকুরবাড়ির দৌউত্তুর, মাসের শেষ দিন পজ্জন্ত মাইনে নিয়েছে হাত পেতে, তাই বলে কি থিয়েটার ছেড়েছে! তবে ঐ কথা. সন্ধ্যো পেরিয়ে না গেলে আসবে না. এটা সব থিয়েটারেই বলা থাকত, ওটুকু বাবুর পাওনা।

'ঐ বিমলবাবুটার এত আটঘাট বাঁধা কিসের, যদি আর কেউ ধরে এই ভয়? তা ওকে যদি আর কেউ ধরে, তোর দিকটাও তো তোকে দেখতে হবে। একদিন অরুচি হবেই, সেদিন তো ছেঁড়া জুতোর মতো ফেলে চলে যাবে। সেদিন কি আর কর্তাকে বাঁধতে পারবি? চেহারার তো এই ছিরি দাঁড়াচ্ছে দিন দিন। ওদিক থেকে যা আসত, মাসে পাঁচ-ছ'শো, তাও যাবে বন্ধ হয়ে। তখন? তখন তো উপোস ভরসা।'

'তখন আর কিছু ভাবব না দাদা, মা গঙ্গা আছেন, তাঁর জল তো শুকোয় নি। আমার আর ভাল লাগছে না, একটুও না। বাঁচাটাই অসহ্য হয়ে উঠেছে। সত্যি বলছি। জীবনে আর কিছু পাবো না, এটা তো পষ্ট, কোথাও কোন ভালই ভগবান লেখেন নি কপালে—কিসের

জন্যে আর বাঁচব?—আপনি যা বলছেন তা কি আমি বুঝি নি? আমি আসলে বাঁধা মেয়েমানুষই হয়ে দাঁড়িয়েছি বিমলবাবুর। তবু আজও, আপনার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে আসাতে মনে হ'ল, সপাং ক'রে এক ঘা চাবুক পড়ল মুখে।'

বলতে বলতেই দু' চোখের কূল ছাপিয়ে ঝরঝর ক'রে জল ঝরে পড়ে।

হীরুবাবু এদিকে এগিয়ে কাছে এসে—যা কখনও করেন নি এই গত প্রায় এক মাসে—একেবারে কোলের কাছে টেনে নিয়ে নীলার শাড়ির প্রান্তেই ওর চোখটা মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আমার বড্ড অন্যাই হয়ে গেছে ভাই, খুব অন্যাই হয়ে গেছে। আসলে থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরে—জি. সি. বলতেন না, থিয়েটারে যে বাজারের মেয়েমানুষ আসে তারা চিংড়ি মাছ পচা, আদা পিঁয়াজ দিয়ে রাঁধলে তবু আদায় হয়, যে ভদ্দর লোকের ছেলেরা এসে বিগড়ে যায় তারা রুই মাছ পচা, তাদের আর কিছু আদায় থাকে না। তা জীবনভর তো বলতে গেলে ঐ রুই মাছ পচাদের সঙ্গেই ঘুরেছি—বড় আর্টিস্টদের কাছে তো পাত্তা পাই নি, তাই জিভটা আলগা হয়ে গেছে। কিন্তু দিদি ইরি মধ্যে হাল ছাড়বি কেন? এখনও বোধহয় সময় যায় নি, তুই একটু একটু ক'রে ওর মুঠো থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা কর্। তুই শক্ত হলেই ও নরম হবে। এখনও টান আছে—টান চলে গেলে তোর কথা একবারও ভাববে না, এ নোচ্চার জাতকে আমার খুব ভাল জানা আছে—আর একশো টাকাও দেবে না, হাজার টাকা তো কোন্ ছার!'

এইটুকু স্নেহেই যেন কৃতার্থ হয়ে যায় নীলা।

তার দেহের প্রতি লোভবর্জিত স্নেহ। তার কাছে বুঝি এ দুর্লভ পাওয়া।

সে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে বসে ভাল ক'রে কান্নার চিহ্ন মুছে নেয় নিজের আঁচলে, তারপর বলে, 'কিন্তু কি ধরে শক্ত হবো বলুন। এমন আস্তে আস্তে হাত-পা বেঁধেছে, টেরও পাই নি প্রথমটায়। আমার

কাছে তো আর কোন পার্টি আসেই না।'

হীরুবাবু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে কি ভাবলেন, তারপর একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেখি, আমি কিছু করতে পারি কি না।···হাসছিস, ভাবছিস্ বুড়ো পাগলাটা কি প্রেলাপ বকছে! হাসিস নি, কাঠবেড়ালীকে দিয়েও রামচন্দ্রর বালি বওয়ার কাজ হয়েছিল সেতু বন্ধনের সময়, চড়ুই পাখিতে মহাপ্রভুর জন্যে একদিনে চটক পাহাড় তৈরি ক'রে দিয়েছিল পুরীতে—উনি গোবর্ধন ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন।·· নারে, আমি না ভেবেচিন্তে আলগা কথা বলছি না, কে জানে, একেবারে জন্তু হয়েই ছিলুম তো, সব যেন ভুলে যেতে বসেছিলুম—তোকে পেয়েই হয়ত এই শেষ বয়সে আবার একটু একটু ক'রে বুদ্ধিসুদ্ধি ফিরছে। আমার দাদার এক ছাত্তর ছিল, এককালে—মানে ছেলে বয়েসে য়্যামেচার ক্লাবে ফিমেল পার্ট ক'রে খুব নাম করেছিল, অনেকে বাজি রাখত মেয়েছেলে কিনা—তা এখন তো আর গোঁপ কামিয়ে মেয়ে সাজার রেওয়াজ নেই—এখন শুনছি আপিস থেকে রিটায়ার ক'রে মেকাপম্যানের কাজ ক'রে বেড়ায়, ভাল টাকা পায়। যে কোন জিনিস ভাল করে শিখলে তা উপকারে লাগবেই। আমার জানাশুনো আর এক ছোকরা আপিসে কাজ করার সময় যা পেত—ক্যামেরা কিনে, ডেভলাপার কিনে—কেবল ঐ ফটো নিয়ে পড়ে থাকত, কত বকুনি খেয়েছে সে জন্যে বাবার কাছ থেকে। তারপর হ'ল কি, বিলিতী কোম্পানি স্বাধীনতার পর চাটি বাটি গুটিয়ে দেশে চলে গেল—ছোকরার চাকরিও চলে গেল। বাকী সকলের মাথায় হাত, হা চাকরি যো চাকরি ক'রে ঘুরে বেড়ায়—এ সঙ্গে সঙ্গে ঘর ভাড়া ক'রে ফটোগ্রাফীর দোকান করে বসল, অতদিন ঘষে ঘষে হাত ভাল হয়েছে, বুদ্ধিসুদ্ধিও ভাল—এ দিকে মাথাও খেলত, মানে এর সেন্‌স্ ছিল—এখন হাজার হাজার টাকা কামাচ্ছে। আমাদের এই মণ্টুও, আগে যখন শুধু পার্ট করত, বিনি পয়সার মেহনত বুঝিস তো—কিন্তু তখনই এক মনে মেকাপের কাজ দেখত, তাকে হাতে হাতে এটা-ওটা যুগিয়ে দিত, জিনিসটার হাড়হদ্দ শিখে নিয়েছিল। শুনেছি তার

খুব ডাক এখন, দেখি যদি তাকে ধরে কিছু সুবিধে করতে পারি। ঐ একটি লোক, কখনও আধ পয়সা ঠেকায় না বটে—তবে দৈবে সৈবে কোন দিন গিয়ে পড়লে খাতির ক'রে বসায়, চা পান খাওয়ায়—মাস্টারের ভাই বলে পেন্নামও করে। দেখি, কি করতে পারি।'

হীরুবাবু অন্যমনস্ক ভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে নেমে যান সিঁড়ি দিয়ে।

চার

তা করলেনও—সেতু বন্ধনে কাঠবেড়ালীর মতোই প্রায় অসাধ্যসাধন করলেন।

এক বড় চা কোম্পানির আপিস ক্লাবে বছরে একদিন ক'রে উৎসব হয়—গান, আবৃত্তি, শেষে অভিনয়। বড় আপিস, বড় ক্লাব, ক্লাবের টাকা ছাড়াও কোম্পানি একটা মোটা টাকা দেয় এই দিনের জন্যে। অনেক পয়সা, উৎসব হয়ও জাঁকিয়ে। বড় বড় গাইয়ে আসে, রেডিওর সংবাদ-পাঠকদের টাকা দিয়ে আনা হয় শুধু শিল্পীদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে, নামজাদা আবৃত্তিকারকরা টাকা নিয়ে এসে আবৃত্তি ক'রে যান।

এঁদের দলের অজয়বাবু বলে এক অফিসারের নাটক লেখার শখ আছে—গত দু'তিন বছর ধরে তাঁরই নতুন নতুন নাটক অভিনয় হচ্ছে এই দিনে। এবারেও হবে। দু'তিন জন বড় অভিনেতা অভিনেত্রীকে আনা হয় ফি বছর টাকা দিয়ে, তবে আরও 'আর্টিস্ট' চাই। নতুন বই, তিন-চার দিন রিহার্স্যাল দিতে হবে, অজয়বাবু নিজেই মোশন মাস্টার, পার্ট দেখিয়ে দেবেন। চার দিন রিহার্স্যাল আর অভিনয়ের দিন ধরে তাঁরা পুরো পাঁচশো টাকাই দিতে রাজী হলেন। হীরুবাবুর সঙ্গে সেই মণ্টুবাবু আর আপিসের লোক এসে অর্ধেক টাকা দিয়ে কনট্র্যাক্ট সই করিয়ে নিয়ে গেলেন। যেদিন যেদিন রিহার্স্যাল হবে তার আগে

জানিয়ে দিয়ে যাবেন সময়টা—আপিসের গাড়ি আসবে, সেই গাড়িই পৌঁছে দিয়ে যাবে। রিহার্স্যাল হবে বিকেলে, সন্ধ্যার আগেই ফেরত দেবেন তাঁরা।

সই করল, টাকাও নিল। ঘটনাটা এমন আকস্মিক ভাবে ঘটল যে বিমলবাবুকে আগে জানাবার অবসর মিলল না। ইচ্ছেও ছিল না অবশ্য, তিনি নিতে দেবেন না—এ তো জানা কথাই।

তবু সেই দিনই বলা দরকার, নইলে ব্যাপারটা ষড়যন্ত্রর মতো লাগবে। নীলা অনেক ইতস্ততঃ করে রাত দশটার সময় বিমলবাবু যখন বাড়ি যাবেন বলে উঠে জামা পরছেন তখন খবরটা দিল।

জামা পরতে পরতে থেমে গেলেন বিমলবাবু, মুখখানা প্রথমে বিবর্ণ পরে কঠিন হয়ে উঠল।

'শিপটন কোম্পানির আপিস-ক্লাব ? বাঃ, এ তো রুই মাছ গেঁথেছ দেখছি। তা ঘটকালিটা করলে কে ?'

গলার আওয়াজ শান্ত কিন্তু কেমন এক ধরনের শান-দেওয়া শোনাল। মনে হয় কথাগুলো গায়ে কেটে বসছে এবার।

নীলা অকারণেই ভয়ে ভয়ে বলে, 'নীচের তলার ঐ দাদা, উনি মানে ওঁর দাদার কে এক পুরনো ছাত্র এই সব ক্লাবে যাতায়াত করে—তাকে বলেই— ।'

'হুঁ। ঐ বুড়োটা। তাই তো বলি। পাগল সেজে থাকে। বজ্জাতি হাড়ে হাড়ে। নেশাখোর তো, নেশার পয়সার জন্যে চুরি-টুরি করবে ভাবছিলুম। তা একেবারে— । ভাল, কত দালালি দিতে হ'ল ?' তেমনি শান-দেওয়া কঠিন কণ্ঠস্বর।

'কৈ, দালালির কথা তো ওঠে নি কিছু। উনি সে ভাবে করেন নি। এ লাইন ভালবাসেন বলেই— । আমিই ভেবে রেখেছি পুরো টাকা পেলে ওঁকে একটা জামা করিয়ে দেব।'

'তা সইটা করার আগে আমাকে একবার জানানোর কথা মনে হ'ল না ! আমি একেবারেই ফালতু পার্টি, পথের লোক, না ? কোন্ ক্লাব কে

কি মতলবে এসেছে—তুমি তো কিছুই জানো না। ফট ক'রে আমাকে না জানিয়ে একেবারে সই ক'রে দিলে!'

'বড় আপিসের ক্লাব, আপনিই তো বললেন। সেক্রেটারী নিজে এসেছিলেন। এতে আর আপনাকে জানানোর কি আছে। এ কাজ করছি তো আজ আর নতুন নয়। সেই সুবাদেই তো আপনার সঙ্গে পরিচয়।'

হঠাৎ বিমলবাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, মুখোশ সরে গিয়ে আসল কুৎসিত মুখখানা বেরিয়ে এল, 'জানানোর কি আছে তা তুমি কি বুঝবে। আমি এতদিন পুষছি—তার একটা কৃতজ্ঞতাও তো আছে। এতটা এগিয়ে গেলে ঐ বজ্জাত বুড়োটার ধাপ্পায়, তোমার এত সাহস হতে পারে তা ভাবি নি।'

ধৈর্যচ্যুতি বুঝি ঘটল নীলারও। তার স্বভাবভীরু কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আজ আগুন জ্বলে উঠল, 'কেন বলুন তো, আপনার হুকুম নিয়ে আমাকে প্রতি পা চলতে হবে! এমন কোন লেখাপড়া কি ছিল আপনার সঙ্গে? এ আমার পুরনো কাজ, এই কাজের সুবাদেই তো আমাকে পেয়েছিলেন! আপনি কি চান আমার রোজগারের সব পথ বন্ধ ক'রে দিয়ে আমাকে দু'পায়ে থ্যাঁতলাবেন! তারপর একদিন যখন অরুচি হবে আপনার, তখন পথে পথে ভিক্ষে করতে বেরোব? যদি বাঁধা মেয়েমানুষই বুঝে থাকেন, সেই মতো মাইনে ঠিক করুন। আমি আখেরের জন্যে কি জমাতে পারি বুঝে দেখব।'

একেবারে পাথর হয়ে গেলেন বিমলবাবু। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, 'এই একটা কাজ পেয়েই যে দেখছি তোমার গলার আওয়াজ বদলে গেল। ঐ হারামজাদা সাজা-পাগল বুড়ো এত কাজ দিয়ে যেতে পারবে তো—যাতে তোমার সংসার চলে—নোলাসর্বস্ব বাপের আর নেশাখোর ভাইকে টানতে পারো। ভাল ভাল, তোমার চললেই ভাল। আমিও তোমার কাছে বাঁধা পড়ি নি। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না—কাকেরা ইচ্ছে করলেই কিন্তু ভাত পায়

না—মনে রেখো।'

বিমলবাবু অনেক কষ্টে মুখের ভাব স্বাভাবিক ক'রে নেমে গেলেন।

কিছু যে একটা হয়েছে তা দু'জনের কারুরই জানতে বাকী ছিল না। তাঁরা উদ্বিগ্ন মুখে ঘরে ঢুকলেন এবার।

নেপেনবাবু বললেন, 'কি হয়েছে রে, বিমলবাবু হঠাৎ রেগে গেলেন কেন? কথা কাটাকাটি হচ্ছিল কিসের?'

তখনও নীলার চোখের দাহ কমে নি। ওর বাবার এই আকুলতায় সহসা তা যেন আরও দ্বিগুণ জ্বলে উঠল। বলল, 'ওঁর অনুমতি নিয়ে এই নতুন কনট্রাক্ট সই করি নি—এটা নাকি আমার খুব আস্পদ্দার কাজ হয়েছে। উনি চোখ রাঙাচ্ছিলেন। আমি সাফ বলে দিয়েছি, এই আমার পেশা, আমি ভাল বুঝেছি, বায়না নিয়েছি। ওঁর হুকুম নেবার কোন দরকার বুঝি নি।'

নেপেনবাবু দরজার ওপারে আড়ি পেতে সবই শুনেছিলেন। তিনি বলতে গেলেন, 'তা রেগেই যখন গেছে দেখলি, একটু নীচু হয়ে মাপ চাইলেই হত। একেবারে অত মেজাজ গরম করতে গেলি কেন শুধু শুধু! হাজার হোক ওর পয়সা আছে, ওর হাজার দোর খোলা।'

'বাবা!' এত চাপা গলায় এতখানি চিৎকার করা যায় নেপেনবাবু তা জানতেন না, তিনি চমকে উঠলেন।

'আপনি মেয়ে বেচে খেতে চান, এর আগে পষ্ট ক'রে বলেন নি কেন? তাই যদি হয় কোন ঐ পাড়ায় ঘর ভাড়া ক'রে দিন—এই বেলা যত বেশি পারি রোজগার ক'রে নিই। এমনভাবে ভবিষ্যৎ খুইয়ে বিনি মাইনেয় বাঁধা মেয়েমানুষ থাকতে যাবো কি জন্যে? সংসারটা চালিয়ে দেয়—এই তো! যেদিন ফেলে চলে যাবে সেদিন কি আমাকে আর কোথাও ভাড়া খাটাতে পারবেন? সে অবস্থা রেখে যাবে না। তখন হয় মালা হাতে ভিক্ষে করতে বেরোতে হবে, নয় তো বাসন মাজার কাজ খুঁজতে হবে।'

এই প্রথম নেপেনবাবু যেন একটা দৈহিক আঘাত বোধ করলেন।

এ কাজের দীনতা আর হীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখের সামনে। তিনি পা-পা করে পিছিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তবে ওঁরা যা আশঙ্কা করেছিলেন তা হ'ল না।

পরের দিন যথাসময়েই ইম্পোর্টেড ঢাউস গাড়িখানা যথাস্থানে এসে দাঁড়াল আবার।

হাসিমুখেই উঠে এলেন বিমলবাবু, হাসিমুখেই অভ্যর্থনা জানাল নীলা। গত রাত্রের কথা উনিও তুললেন না, নীলাও তোলার প্রয়োজন বুঝল না। মা মিনতি করেছিলেন স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে—'যদি আসে একটু মাপ চেয়ে নিস—'অনাবশ্যক বোধেই সে নাটক করতে চাইল না।

এ কথাও যেমন তুললেন না বিমলবাবু, কাল রাত্রে যে এই পাড়ায় গাড়িতে ওঠার আগে আরও একটা নাটক হয়ে গেছে তাও বললেন না।

গাড়িটা ইচ্ছে ক'রেই একটু দূরে রাখেন—আজও তাই ছিল। সেদিকে এগোচ্ছেন, অন্ধকার পথে একটা আলো মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, আবার স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সিগারেট বা বিড়ি। অন্ধকারে অভ্যস্ত হতে মানুষটাকেও চেনা গেল—হীরুবাবু। সেই অদ্বিতীয় ময়লা লুঙ্গী এবং ছেঁড়া গেঞ্জি।

জ্বালাটা তখনও আগ্নেগিরির মতোই ভেতরে ফুটছে—ওঁকে দেখে সেটা বেরিয়ে আসার পথ পেল, 'কেন বলুন তো, এ সব হারামজাদকী শুরু করলেন! কি চান আপনি? দালালি? তাহলে বলুন—কত আর হবে, সে ক'টা টাকা আমিই দেব আপনাকে। এমনভাবে মেয়েটার মাথা খাচ্ছেন কেন? ভদ্দরলোকের মেয়েকে পাঁচটা লোচ্চায় মিলে টানাটানি করবে সেইটে ভাল হবে? না-কি কুটনিগিরি ক'রে বাবু জুটিয়ে দিয়ে দু'পয়সা কামাতে চান? এমনভাবে আমার সঙ্গে লাগবেন না বলে দিলুম, আগুনে হাত দিতে গেলে হাত পোড়ে, এ তো পুরনো কথা।'

চাপা গালায় হিসহিস ক'রে কথাগুলো বেরিয়ে আসে, মনে হয় কোন বিষাক্ত সাপের ক্রুদ্ধ গর্জন।

অত রাত্রে হাউসিং এস্টেটের পথ নির্জন হয়ে এসেছে, আশেপাশে কেউ নেই, অধিকাংশ ফ্ল্যাটেরই জানলা অন্ধকার। রাস্তার আলোর বাল্‌ব্‌ চুরি যায় প্রায়ই, পথে আলোর আভাস বিশেষ নেই। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছেন না, তবে মানবচরিত্র-অভিজ্ঞ বৃদ্ধ—বিশেষ যিনি এই শ্রেণীর মানুষই বিশেষ দেখেছেন—কণ্ঠস্বরেই বিমলবাবুর উত্তাপটা অনুমান করতে পারলেন। এতখানি জিভ কেটে বললেন, 'রাধে মাধব, বাবু কি বলছেন! আপনার সঙ্গে আমি লাগতে যাবো! হাতির সঙ্গে মশা, সে কথা আমার মনের কোণেও আসে নি কখনও, মাইরি বাবু, এই আপনার দিব্যি বলছি। আমি ভাবলুম—এই তো পাবলিক থিয়েটারের অনেক মেয়েই প্লেও করে আবার আপনার মতো বড়লোক বাবুদের কাছে বাঁধাও থাকে। এদান্তেই জিনিসটা কমেছে—ঘরে ঘরে চলছে রাসলীলা—আগে তো একটা রেওয়াজই ছিল। তা ধরুন গে এটাও যে দরকার, আপনার যখন অরুচি ধরবে আপনি ফেলে চলে যাবেন—এ আবার বাবু পাবে কোথায়? ঐ বাজারেই তো দেখা-শুনো হয়। নতুন খদ্দের ধরার ও-ই সেরা জায়গা। আর টানাটানি করবে কে, ও-ই বা তাদের জালে পা বাড়াবে কেন। আপনার কাছে বাঁধা রয়েছে, এমন সান্‌শা বাবু পাবে কোথায়? না, না, বাবু, সে সব কিছু ভাববেন না, আপনার মাল আপনারই থাকবে—যদ্দিন আপনার খুশী।'

'বাঁধা' শব্দটা বারবার অতি অনায়াসে অতি সহজে বলে গেলেন হীরুবাবু, কিন্তু প্রতিবারেই তা দৈহিক আঘাতের মতো বিমলবাবুর মুখে এসে লাগল। এইমাত্র নীলা যে কথাগুলো বলেছে তার উৎসটাও বুঝতে পারলেন। এ লোকটাকে যত নিরীহ যত নির্বোধ ভেবেছিলেন তা নয়—বরং বোধ হচ্ছে বিপজ্জনক।

বিপজ্জনক যে বিমলবাবুও, হীরুবাবুর থেকে কেউ বোঝে নি এদের মধ্যে। তিনি নিমেষে কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন, গলা নামিয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে বললেন, 'না বাবু, মাইরি বলছি, আমি অন্য কথাই ভেবেছি, একদিন তো কাঁচা বয়েসের টান চলে যাবে, বাঁধা রাঁড় বলে নামও রটেছে

—আপনি যে টানে এসেছেন, সে জিনিস তো আর থাকবে না—তখন আপনিও আর আসবেন না, নতুন লোকও কেউ জুটবে না। তবু যদি এ দিকের পথটা খোলা থাকে, দু'বেলা দু'মুঠো নুন-ভাত জুটতে পারে। আর ঐ তো দেখছেন ফ্যামিলি, সবাই তো মেয়েটার রোজগারে বসে খাচ্ছে, বুড়োর এখনও যা গতর—সহজে মরবেও না। মেয়ে না খাওয়াতে পারলে মেয়ের মাংসই কেটে খাবে। সেই জন্যেই অভ্যেসটা থাকা দরকার, আর যোগাযোগগুলোও। সেটা নষ্ট হয়ে গেলে কোথায় কে ডাকবে বলুন, মেয়েটাই বা কাকে যেয়ে ধরবে?'

তারপর একটু থেমে—বিমলবাবু তখন গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছেন কিন্তু হীরুবাবু অত সহজে ছাড়বার পাত্র নন—গাড়ির পথ আগলে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এর তো তেমন ক্ষ্যামতাও নেই, একাজে অত আটাও নেই। নইলে একমনে যদি সাধনা করত, তাহলে লোকে বনে-জঙ্গলে গিয়েও খুঁজে খুঁজে ধরে আনত। ঐ যে তারাসুন্দরী, নাট্যসম্রাজ্ঞী কি বলত লোকে সাধে, রিটায়ার করে গিয়ে ভুবনেশ্বরে ছিল, ভাদুড়িসায়েব সেখেনে গিয়ে ধরে এনেছিলেন! কি বিত্তান্ত না আপনার সঙ্গে প্লে করব চিরদিনের স্বপ্ন আমার।

'তা সত্যি, ওদের সাধনাও যে ছিল তেমনি। পয়সাকে পয়সা মনে করে নি কখনও, কাজ ক'রে গেছে তপিস্যের মতো ক'রে। তবে শুনবেন, আপনার রাত করিয়ে দিচ্ছি বোধ হয়—তবু একটা গপ্প শুনে যান। গপ্প নয়, আমাদের চোখে দেখা। তখন আর কোথাও নামছে না, বাড়িতেই বসে থাকে, মনটা গেছে ভেঙে, আর যেখানে রাজত্ব করেছে সেখানে দাসীবিত্তি করবে সে এমন লোক ছিল না। কে এক নরেন সিংহি না কে—থিয়েটারেরই পুরনো লোক, আমি ঠিক চিনতুম না—তার বেনিফিট নাইট, সে গিয়ে ধরে পড়ল, সাজাহান নাটক, সব ব্যবস্থা ঠিক করেছে, দানীবাবু আওরঙ্গজেব করবেন, তারাসুন্দরীকে জাহানারা করতে হবে। বাকী স্টারের লোকজন, ওখানেই হবে। তা হবে, ও হরি, ঠিক আগের দিনই হবি তো হ—জাহানারার কলেরা, মানে আসল

কলেরা নয়, তবে ঐ রকমই, এখন কি একটা নতুন নাম দিয়েছে ডাক্তাররা, গ্যাস্ট্রো-ম্যাস্ট্রো কি বলে। তা যা বলছিলুম, নরেনবাবু তো শুনে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগল, মাথার চুল ছিঁড়ে কপাল ঠুকে একাকার। বেশ কিছু টাকা তার দুঃখের ঘর থেকে তখন বেরিয়ে গেছে —এস্টেজের ভাড়া, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, কাগজের বিজ্ঞাপন—এখন যদি অন্য কাউকে জাহানারা সাজায়, টিকিটের সব টাকাই বোধ হয় ফেরত দিতে হবে। তখন এমনিই ছিল, এক-একজনের এমন নাম—তার জন্যেই হাজার হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হত, কাজেই সে না নামলে অডিয়েন্স ফেরত চাইবে বৈকি।

'ওর এই কপাল চাপড়ানো শুনে সম্রাজ্ঞী বললেন, "না, যদি প্রাণটা থাকে, আমি যাবোই, তুমি নিশ্চিন্তি থাকো।" ডাক্তার, ওর ছেলেমেয়েরা বললে, সে কি! এই অবস্থা! সবাই অবাক্।...এলও ঠিক, বিকেলে এক কাপ ডাবের জল খেয়ে এসে নামল, পা টলছে, মাথা ঘুরছে, আর পার্টও তো তেমনি, প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত উইংসে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগাগোড়াই ক'রে গেল বাবু, কি বলব! বিনি পয়সার কাজ, তবু তখন ওদের এমনি ছিল চওড়া মন! এরা সেটা ভাবতেও পারবে না।'

কোনমতে দরজাটা খুলতে পেরে বিমলবাবু উঠে পড়েছেন ততক্ষণে, ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে—হীরুবাবু তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বিমলবাবু—নইলে আরও হয়ত দু' ঘণ্টা এমন চালিয়ে যাবে, যা লোক!

বিমলবাবুর গাড়ি বেরিয়ে গেল। ততক্ষণে বিড়িও নিভেছে, হীরু-বাবু আপন মনেই কেমন একটা টাকরার শব্দ ক'রে হাসতে হাসতে বাড়ির দিকে ফিরলেন। অন্ধকার বলেই তাঁর সে হাসি আর ধূর্ত চাউনি কারও নজরে পড়ল না।

পাঁচ

নতুন নাটকে অভিনয় করার জন্য দু'জন নামকরা অভিনেতাকে আনা হয়েছিল, একজন অভিনেত্রীও এসেছিলেন এক নামকরা দল থেকে। এ ছাড়াও কিছু কিছু অন্য আপিস বা অন্য ক্লাবের গেস্ট আর্টিস্ট এসেছিলেন। এর মধ্যে একজন একেবারেই নবাগত, অজয়বাবুর ভাইয়ের বন্ধু—আবগারী না কি পুলিসের কোন্ বিভাগে কাজ করেন, দেখতেই এসেছিলেন বন্ধু হিসেবে—শেষ মুহূর্তে তাঁকেও অভিনয়ে নামতে হ'ল। যে ছেলেটির এক নবীন আপিস-মাস্টার সাজবার কথা—তার হঠাৎ ঐখানেই ভেদবমি শুরু হয়ে গেল, অজয়বাবু পাগলের মতো হয়ে উঠেছেন—হঠাৎ সেই ছেলেটি, হীরক তার নাম, সে বলল, 'দাদা, আপনি তো বলছেন দু' শীনের পার্ট—যদি স্ক্রিপ্টটা একটু পড়ে নিতে দেন—আমি চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।'

অজয়বাবু তো অবাক্, 'কিন্তু তুমি তো ভাই বইটা পড়োও নি একবার, পার্ট মুখস্থ নেই।'

'সেই জন্যেই তো পড়ে নিতে চাইছি। আপনার তো ছটায় ফাংশান আরম্ভ, নাটক শুরু হবে সাতটায়—এখনও সওয়া ঘণ্টা সময় আছে, বইটা পড়তে বড় জোর আধ ঘণ্টা লাগবে, পার্টটা বার-দুই পড়ে নিতে আরও কম। তাতেই হবে। আর সাজবার তো কিছু নেই, আমি তো ইউনিফর্ম পরে আসি নি, যেমন আছি তেমনিই নেমে যাবো। রঙ করার দরকার নেই, আপনাদের শখ হয় একটু পাউডার বুলিয়ে নেবো?'

রঙ করার যে দরকার নেই তা সকলেই স্বীকার করলেন। এমন দুধে-আলতা রঙ বাঙালীর ঘরে দুর্লভ। শুধু রঙই নয়—হীরক ছেলেটি যে এত সুপুরুষও—তা এই প্রথম লক্ষ্য করলেন অজয়বাবু। সুগঠিত পেশী-বহুল দীর্ঘ দেহ, এতটুকু বাহুল্য মেদ নেই কোথাও, আয়ত দু'টি চোখে যেন অতলস্পর্শী গভীর দৃষ্টি, গম্ভীর হয়ে থাকলে যেচে কথা কইতে

সাহস হয় না, অথচ মুহূর্তের মধ্যেই তা প্রসন্ন বা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন মনে হয় শিশুর মতোই সরল আর কৌতুকপ্রিয়।

অন্য কোন উপায়ও নেই ; অজয়বাবু মনে মনে ভেবে দেখলেন, এর তবু চেহারাটা আছে, দেখলে মনে হয় বুদ্ধিমানও—বাকী হাতের কাছে যা লোক আছে—তারা পার্ট পড়ে বুঝে নিতে পারবে কিনা সন্দেহ।

খাতাখানা নিয়ে হীরক—ভেতরে যেখানে গ্রীনরুমের পাশে শিল্পীদের মেকাপ হয়ে গেলে এসে অপেক্ষা করার কথা, সেইখানে চলে গেল। আশপাশে উচ্চরব আলোচনা, তর্কাতর্কি, তার মধ্যেই নিবিষ্টচিত্তে পুরো-বইটা বার-দুই পড়ে নিয়ে নিজের পার্টটা আলাদা আর একবার পড়ে উঠে এসে বলল, 'নাউ য়্যাম রেডী। বলুন এবার কোন সাজসজ্জার দর-কার আছে কিনা।'

অজয়বাবু ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'একবার রিহার্সাল পর্যন্ত হ'ল না।'

'সে তো আর সময়ও নেই। আপনি ওদিকে ফাংশান কনডাক্ট করবেন, না রিহার্সাল দেওয়াবেন ? মনও দিতে পারবেন না। তার চেয়ে দুর্গা বলে ঝুলে পড়ুন। মনে হয় কাজ চালিয়ে নিতে পারব।'

'তাই যা হয় করো। না, তোমার মেক-আপ লাগবে না। তবে অপরে যা পুরু ক'রে রঙ মেখেছে—তুমি এমনি বেরোলে তাদের দিকে চাওয়া যাবে না। বরং একটু পাউডারই বুলিয়ে নাও, তারপর ভুরুটুরু-গুলো মুছে পরিষ্কার ক'রে নিও!'

আজকাল অঙ্ক গর্ভাঙ্ক দৃশ্যান্তরের দরকার হয় না। একই সেট-এ পাঁচটি দৃশ্য বা অঙ্কে নাটক শেষ। তার মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে হীরকের পার্ট। বড় ফার্মের মালিকের ছেলে, নতুন মালিক হয়ে বসেছে, লেখাপড়া জানা, স্মার্ট, কিন্তু যেমন অর্থলোভী, তেমনি নিজের অন্যান্য প্রাপ্য সম্বন্ধেও সচেতন। নীলা সেই অফিসেরই নবাগতা স্টেনো। মনিব শুধু আঠারো আনা কাজই নয়—ওর সম্মান এবং ধর্মও তাঁর প্রাপ্য বলে মনে করেন। মেয়েটি চাকরি খোয়াতে রাজী কিন্তু নিজের সম্মান দিতে রাজী হয় নি। সে প্রত্যাখ্যানে নবীন মনিবের অহঙ্কারে ঘা লাগে। সে

নির্মমভাবে সর্বনাশের জাল বিস্তার ক'রে প্রতিশোধ নেয়, মেয়েটি মা দাদাদের বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ ক'রেও রেহাই পায় না, আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

এই হ'ল নাটকের বিষয়বস্তু। পালার নাম নতুন জমিদার। অর্থাৎ জমিদাররা গেছে, তাদের স্থান নিয়েছে এই নতুন শিল্পপতিরা, বড় অফিসাররা। অজয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আড়ালে বলাবলি করে—সাম্প্রতিক এক অতি বিখ্যাত লেখকের ছায়া নিয়ে লেখা। তার বইতে কোন 'ক্রুডিটি' নেই, অজয়ের আছে। তাতে অবশ্য অজয়ের কিছু আসে যায় না। তিনি জানেন, এ-বই ছাপা হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

স্টেজে বেরোবার আগে অজয় হীরককে আশ্বাস দিল, 'তুমি উইংস-এর কাছাকাছি থেকো, আমি প্রম্প্‌টারকে বলে দিয়েছি তোমার বেলা গলাটা একটু চড়িয়ে দেবে।'

হীরক বৃথা কোন অহঙ্কার প্রকাশ করল না কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল প্রম্প্‌টারের কোন দরকারই হ'ল না। হীরক উইংসের কাছেও রইল না, সহজভাবেই অভিনয় ক'রে যেতে লাগল আর গোটা পার্টটাই সে অবলালাক্রমে স্মৃতি থেকে বললে, নির্ভুলভাবে, একটি শব্দও বাদ গেল না।

অজয়বাবু এসে দু হাতে ওর ডান হাতখানা ধরে অভিনন্দন জানালেন, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য! আমি এমন কখনও দেখি নি। শুধু তোমার স্মৃতিশক্তি নয়, তোমার অভিনয়ের ক্ষমতা দেখেও অবাক্ হয়ে গেছি, মনে হচ্ছে তোমাকে দেখেই আমার লেখা। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যেই দেখছি—হরেনের অসুখ হয়ে ভালই হয়েছে।'

নীলা প্রথমে ওকে দেখেই কেমন যেন চমকে গিয়েছিল। শুধু রূপ নয়, অভিনয়-দক্ষতাও নয়—আরও যেন কি আছে লোকটার—যা চুম্বকের মতো মন আর চোখ টেনে নেয়। বইতে পড়েছে ব্যক্তিত্ব, লোকে বলেও; বোধ হয় এ-ই ব্যক্তিত্ব। তার পরও যত দেখছে—মধুর হাসি, বিনত ভদ্র ব্যবহার, অপরের কথার উত্তরে ঠিক ঠিক কথাগুলির প্রয়োগ

—আবার কেউ কেউ কোন অশালীন রসিকতা করতে কি গায়ে পড়ে অন্তরঙ্গতা দেখাতে এলেই সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে যাওয়া—তত বিস্ময়-বোধ করছে।

'আপনি কিন্তু ভারী সুন্দর কাঁদেন, দেখলে মনেই হয় না যে আপনি অভিনয় করছেন, মনে হয় সত্যিই মনের কথা এগুলো।'

মুগ্ধমুখী নীলাকে সম্বোধন ক'রে বলে ওঠে হীরক। নীলার বুঝতে একটু দেরি হয় যে সত্যি সত্যি তাকেই সম্বোধন করছে সে। আসলে হীরকের কথা ভাবতে ভাবতেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তাতেই এ অপ্রত্যাশিত সম্ভাষণের তখনই উত্তর দিতে পারে নি। তবে সামলে নিতে বেশী দেরিও হ'ল না, হেসে উত্তর দিল, 'আপনি কিন্তু তেমনি সুন্দর নিষ্ঠুর হতে পারেন। আমি ভুলেই যাচ্ছিলুম অভিনয়ের কথা, ভাবছিলুম এ লোকটার এত সুন্দর চেহারা, এমন মিষ্টি হাসি—এ এমন শয়তান, এত নির্মম সাংঘাতিক লোক!'

'বা! আপনি কথাও বলেন দেখছি চমৎকার। থ্যাঙ্কিউ ফর দ্য কমপ্লিমেণ্ট। অ্যাম পেড উইথ মাই ওন কয়েনস্। আপনাকে দেখে খুব ভালমানুষ আর ভীতু ভীতু মনে হয়েছিল, আপনি যে এত স্মার্ট ধারণাই করতে পারি নি।'

সত্যিই নীলা আজ ভাল অভিনয় করেছে, নিজেই বুঝেছে তা। আসলে এই চরিত্রের সঙ্গে তার নিজেরও ভাগ্যের কোথায় একটা মিল আছে। যখন সে মনিবের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে বলছে, 'আপনি আমার ধর্ম, আমার কুমারীত্ব, আমার ইজ্জৎ, আমার ভবিষ্যৎ সব নিয়েছেন—আরও কি চান আপনি! আরও কত সর্বনাশ করলে আপনার তৃপ্তি হয়! আপনি এবার দয়া করুন, আমি আপনার ক্রীতদাসী হয়েই থাকব, শুধু আমার মা আর দাদাকে অব্যাহতি দিন।' তখন স্থানকাল-পাত্র সব ভুলে নিজের অন্তরের এতদিনের সঞ্চিত বেদনাই যেন সে জানাচ্ছিল সে বিধাতার কাছে। ঐ চরিত্রটি তখন তুচ্ছ তথ্যমাত্র হয়ে গিয়েছিল।

হয়ত আরও কিছু বলত হীরক, কিন্তু সেই সময়ই খবর এল, নীলার গাড়ি প্রস্তুত, ঐ দিকে আরও দু'জন মহিলা যাবেন। এ সুযোগ না নিলে বিস্তর দেরি হয়ে যাবে।

একটা মেডেল দিয়েছেন কোম্পানির সাহেব ম্যানেজার—নীলার জীবনে এই প্রথম—ফুলের তোড়া দিয়েছেন মেমসাহেব, খাবারের বাক্স, বাকী টাকার চেক নিয়ে এসে গাড়িতে বসল নীলা। উৎফুল্ল বোধ করারই কথা—কিন্তু ওর অকারণেই মনে হতে লাগল—হীরকও এই সঙ্গে বেরিয়ে এলে ভাল হত। আরও কতক্ষণ থাকবে কে জানে, ওর ঐ সঙ্গ ও মিষ্টি কথা এখনও বহু লোক শুনবে, হয়ত সবাই বেরসিক রইল, তারা এর মূল্যও বুঝবে না।

ঠিক মনোভাবটা কি তা বুঝল না। আসলে ও যে সেই অপরিচিত বাকী লোকগুলো সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষাই বোধ করছে—সেটা একবারও মনে হ'ল না ওর।

সেদিন নীলার অভিনয় ওখানে সকলেরই ভাল লেগেছিল। আপিসের সকলে তো খুশী হয়েইছেন—অন্য যে সব বাইরের দর্শক ছিলেন, তাঁরাও প্রশংসা ক'রে গেছেন।

খবরটা শুনিয়ে গেছেন মণ্টুবাবু। কিন্তু শুধু সে জন্যেই আসেন নি, আর একটি আপিস ক্লাবে কী একটা আধুনিক নাটক হবে, সেখানে একটি ছোট ভূমিকা তাঁরা ওকে দিতে চান, সে খবরটাও দিলেন। এ বই একটা দল বহুদিন ধরে পাবলিক স্টেজে অভিনয় করছে—ইচ্ছে করলে নীলা দেখে আসতেও পারে। সে টিকিট ও গাড়ি ভাড়া তাঁরাই ব্যবস্থা করবেন। তবে এ খুব বড় কোন আপিস নয়—তিনশো টাকার বেশি তাঁরা দিতে পারবেন না।

তিনশো টাকাই যথেষ্ট। করলে ও দুশো টাকাতেই রাজী হতে পারে। তবু তখনই একেবারে 'হ্যাঁ' বলতে পারল না নীলা, একদিন সময় চেয়ে নিল।

সেদিন কেমন অভিনয় হ'ল তার উত্তরে নীলা একটু বেশী উচ্ছ্বাসই প্রকাশ ক'রে ফেলেছিল। বাসি ফুলের তোড়াটা তখনও ঘরে ছিল ; মেডেল চেকও- দেখাল বিমলবাবুকে। সেই সঙ্গে আশ্চর্য অভিনেতা হীরক ব্রহ্মচারীর অবিশ্বাস্য স্মৃতিশক্তি ও অপূর্ব অভিনয়দক্ষতার প্রসঙ্গও এসে পড়বে—এও স্বাভাবিক। তার রূপ, তার সহজ সৌজন্য, সুন্দর কথাবার্তা ইত্যাদি সম্বন্ধেও অতিশয়োক্তি একটু হয়েছিল বোধ হয়—শুনতে শুনতে বিমলবাবু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, সেটা নীলার চোখ এড়ায় নি।

এর পর সে উচ্ছ্বাস প্রশমিত হওয়াই উচিত, হয়েও ছিল ; কিন্তু তখন অনিষ্ট যা হবার হয়েই গেছে। বিমলবাবু বাঁকা হেসে বলেছিলেন, 'তা তোমার সে কোহিনূর হীরেটি এখানে আসবেন না তোমার সঙ্গে দেখা করতে ? তোমার কান্না তাঁর এত ভাল লেগেছে, হাসিটাও একবার দেখিয়ে দাও !'

নীলা ভ্রূকুটি ক'রে বলেছিল, 'তিনি আসবেন কেন ? আমার এখানে কত ক্লাবের কত লোক আসে ? আমার তো মাথা খারাপ হয় নি যে রাজ্যের লোককে এই খাঁচায় আসতে বলব !' তারপর সেও বাঁকা কথাই বলেছিল, 'আপনার কোন চিন্তার কারণ নেই, তাঁর যা চেহারা, শুনেছি ভাল চাকরি করেন—একটা তুড়ি দিলে ভাল ভাল মেয়ে গিয়ে পায়ে আছড়ে পড়বে। তবে সে প্রকৃতির লোকও নয়—ওখানে এক কাপ চা কি এক গ্লাস জলও খেলেন না। শুনলাম নিরামিষ খান এবং দু'বেলা আসল খাওয়া ছাড়া কোথাও কিছু খান না।'

এও এক রকমের প্রশংসা—এতে বিমলবাবুর মুখের কাঠিন্য কঠিনতরই হয়ে উঠেছিল।

সেই কারণেই বিমলবাবুকে একবার বলে না নিয়ে নতুন ক্লাবের বায়না নিতে সাহস হয় নি নীলার। হীরুবাবুও তাকে গতকালই সাবধান করে দিয়েছেন ! 'খুব সাবধান ভাই, লোকটা সাপের মতো হিসহিসিয়ে ওঠে। কোন্ দিক দিয়ে যে ছোবল মারবে তার ঠিক নেই।'

সেটা নীলাও বুঝেছে। এত দিন বিমলবাবুকে অলস ধনী ও কামুক, নারীমাংসলোলুপ বলেই জানত। সেদিন ওঁর ঈর্ষা ও হিংস্রতার চেহারাটা দেখে পর্যন্ত একটু ভীত হয়ে পড়েছে। মনে হয়েছে এর অসাধ্য কিছু নেই, অধিকাংশ ধনী ব্যক্তির মতো সকলের কাছ থেকে অবিচলিত বশ্যতাই আশা করে—আর এর ইচ্ছার এতটুকু বিরোধিতা করলেও প্রচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। এসব ব্যাপারে ওর কোন প্রাক্তন অভিজ্ঞতা নেই বলেই সে-প্রতিহিংসার পরিমাণ ও সম্ভাবনা কল্পনা করতে পারে না, শুধু একটা অজানা ভয়ে গা-টা সিরসির করে মধ্যে মধ্যে।

কিন্তু বিমলবাবুর কাছে প্রস্তাবটা করতেই তিনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, করবে বৈকি। ও আপিস আমি জানি, ভাল আপিস। ওরা ঠকাবে না কি কোন বিপদে ফেলবে না। তা ছাড়া মণ্টুবাবু যখন বলছেন—জানাশুনো লোক, তখন আর ভয় কি। ও-বইও আমি দেখেছি। ছোট পার্ট, প্রথম দিকেই তার কাজ শেষ, ঠিক সময়ে ফিরে এলে চাই কি, আমার সঙ্গেও দেখা হবে। আমি তো ঐ সময়েই আসি—সাড়ে সাতটা-আটটা।'

তারপর একটু থেমে আরও নরম গলায় বললেন, 'তোমার কত কি বিপদ-আপদ হতে পারে ভেবেই সেদিন কথাগুলো বলেছিলুম, আমার কোন স্বার্থের জন্যে নয়। এই তো যেমন জিজ্ঞেস করলে, সেদিন তেমনি বলে নিলেই হত। আমি কী বারণ করতুম, এমন ভাল একটা চান্স।'

নিশ্চিন্ত হ'ল নীলা। পরের দিন মণ্টুবাবুর সঙ্গে ওঁদের সেক্রেটারী এসে আগাম একশো টাকা দিয়ে ভাউচার সই করিয়ে নিয়ে গেলেন। কথা রইল তিনি ওখানের টিকিট আর ট্যাক্সি ভাড়া আর ক'দিন পরে এসে দিয়ে যাবেন। সেই দিনই রিহার্স্যালের তারিখ ও সময় জানিয়ে যাবেন। পার্টটাও এখনো লেখা হয় নি, সেদিন দিয়ে যেতে পারবেন।

কিন্তু মণ্টুবাবুদের টিকিট পাঠাবার কোন দরকার হ'ল না, বিমলবাবু সেদিন রাত্রে এসে বললেন, 'আমি ও-বইটার দু'খানা টিকিট করেছি,

কাল ছ'টায়। চলো, আমিও যাই, আর একবার দেখে আসি।'

নীলার বিস্ময়ের শেষ রইল না। এর আগে বিমলবাবু ওকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যান নি। এমন কি যে ক্লাবের উনি সভাপতি, যেখানে নীলার সঙ্গে ওঁর প্রথম আলাপ—সেখানেও না। ওঁর নিজের গাড়িও কোন দিন দেন নি নীলার কোথাও যাওয়ার জন্যে। বোধ হয় সম্পর্কটা পরিচিত সকলের আলোচ্য হয়ে উঠবে এই ভয়েই। বিস্মিত হ'ল, তবে এটা সেদিনের কদর্য ব্যবহারের ক্ষতিপূরণ, এই ভেবে খুশীও হ'ল।

অভিনয় শেষ হলে বাড়ি পর্যন্ত এলেন বিমলবাবু, তবে বেশিক্ষণ রইলেন না। বললেন, 'খুব একটা জরুরী কাজ আছে, ন'টায় এক ভদ্রলোকের কাছে যাবার কথা। অন্য একটা কথার জন্যেই এলুম। তুমি—তুমি আমার একটা উপকার করবে?'

খুব সহজ ভাবেই বললেন, তবু বলার ভঙ্গীতে ও গলার আওয়াজে একটা মিনতিই প্রকাশ পেল।

এ-ধরনের দীনতা প্রকাশ বিমলবাবুর পক্ষে একেবারেই অবিশ্বাস্য। চমকে উঠল নীলা, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, 'আমি! সে কি! অবশ্য আপনি বললে নিশ্চয় করব। কিন্তু কী কাজ, সে কি আমায় দিয়ে হবে?'

গলাটা খুব নামিয়ে বিমলবাবু বলেন, 'আমাদের ব্যবসায় কিছু বাঁ হাতের লেনদেন হয়—জানো তো? ঘুষের ব্যাপার আছে। নগদ টাকা দিতে হবে একজনকে, নম্বুরী নোট চলবে না। পাঁচ টাকা দশ টাকার নোটে দিতে হবে। ভদ্রলোক মানে বড় অফিসার একজন, নিউ আলিপুরে থাকেন। তাঁকে টাকাটা পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। ছোট্ট একটা স্যুটকেসে থাকবে টাকাটা, অত খুচরো নোট স্যুটকেস ছাড়া ধরবে না। আমার গাড়ি কি আমার লোক দিয়ে পাঠানো চলবে না। কোন্ দিক থেকে কে দেখে ফেলবে, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ যদি টের পায়—অন্য সাক্ষী প্রমাণের দরকার হবে না, আমার জেল হয়ে যাবে। তুমি মেয়েছেলে, ট্যাক্সি ক'রে যাবে কেউ কোন সন্দেহ করবে না।'

নীলা ভয় পেয়ে যায়, 'সে কত টাকা? যদি এমনি কোন হামলা হয়? চোর ডাকাত? ট্যাক্সি করে যেতে বলছেন, ট্যাক্সিওলাই যদি আমাকে খুন ক'রে কোথাও ফেলে দিয়ে টাকা নিয়ে সরে পড়ে? এমন তো আখ-ছারই হচ্ছে! আর কেউ সঙ্গে যাবে তো?'

'পাগল। তবে আর এত কথা বললুম কি? কাউকেই বিশ্বাস নেই। মানে টাকাটার জন্যে অবিশ্বাস যে তা নয়—এই দেওয়াটাই কাউকে জানানো চলবে না। টাকা এমন কিছু বেশি নয় যে সে জন্যে ডাকাত পড়বে, মোটে ছ' হাজার টাকা। আর ট্যাক্সিওলা? সে আমার চেনা লোক, এর আগেও এমন কাজে লেগেছে, সে পাওনা ভাড়া ছাড়াও মোটা বকশিশ পায়, সে বেইমানী করবে কেন? ঝুঁকি নেওয়া তো, যদি এমনিই বারে বারে মোটা টাকা কামায়—সেই তো তার লাভ। আগে আমার ভাগ্নে সঙ্গে গেছে এক আধবার। এখন দেখছি সে একটু চুলবুল করছে, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চায়। তাকে আর আমি এই ব্ল্যাকমেলের সুযোগ দিতে চাই না।'

'তা কোথায় যাব, কী বলব—' নীলার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, এসব চোরাই ব্যাপার তার একটুও ভাল লাগছিল না, বলল, 'বাবাকে সঙ্গে নেব?'

'না না। পাগল নাকি! খবরদার। এমনি নিতে কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাহলেই তো তাঁকে কিছু বলতে হবে, তিনি আবার তোমার মাকে বলবেন—এই ক'রেই পাঁচ-কান হয়।'

'তা বাড়িতে কি বলব?'

'বলবে, নতুন একটা ক্লাব, বিমলবাবুর চেনা, হঠাৎ ঠেকে গেছে, আজ ফুল রিহার্স্যাল, এক আর্টিস্টের অসুখ! যদি আমাকে দিয়ে চলে, তাহলে মোটা টাকা দেবে। পাঁচ দিন পরে প্লে। আমি বরং বায়নার টাকা বলে শ' দুই টাকা দিয়ে দেব, তাহলে আর তোমার বাবা সন্দেহ করবেন না। ট্যাক্সি দোরে এসে দাঁড়াবে, যেমন তোমার রিহার্স্যাল থাকলে আসে—একজন সঙ্গে থাকবে, সে মোড়ে নেমে যাবে, ঐদিক দিয়ে ঘুরে

যাবে গাড়ি। কোথায় যেতে হবে বলবীর সিং জানে, সে-ই সেখানে নিয়ে গিয়ে বেল টিপে ভদ্রলোককে ডেকে দেবে। তিনি বেরিয়ে এসে স্যুটকেসের চাবিটা দেখিয়ে নিয়ে চলে যাবেন। তাতেই বুঝবে ঠিক লোক। আর সে কোন দায়িত্ব তোমার থাকবে না—অন্য লোক নেয় সে ঝুঁকি আমার।'

ট্যাক্সি আসবার কথা ছিল সাতটায়—এল সাড়ে সাতটারও পরে। নীলা প্রস্তুত হয়ে বসে বসে যখন প্রায় অস্থির হয়ে উঠেছে, তখন হর্ন বাজল। গাড়ির নম্বর দেওয়া ছিল, একবার চেয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেমে এল। গিয়ে যখন গাড়িতে উঠবে, কি মনে হ'ল, একবার একতলায় উঁকি মারল।

হীরুবাবু সামনেই বসে বিড়ি খাচ্ছিলেন, বললেন, 'এত রাত্রে কোথায় যাবি দিদি?'

'সাধনায়', বলে হেসে উঠল নীলা, 'সব খবর নাই বা শুনলেন, এই একটা ক্লাবের রিহার্স্যাল আছে। হঠাৎ তাদের একটা মেয়ের অভাব হয়েছে, যদি পছন্দ হয় মোটা টাকা দেবে।'

'এত রাত্রে রিহার্স্যাল?' হীরুবাবু ভুরু কোঁচকান।

'ফুল রিহার্স্যাল যে। হাউসে হবে।'

'কাল শুনি নি তো। কৈ, কাকেও আসতেও তো দেখি নি।'

'সব বুঝি নজর রাখেন এইখানে বসে বসে, গোয়েন্দাগিরি? দাঁড়ান, কাল আপনার চায়ে নুন দেব।...না দাদা, এ খবরটা বিমলবাবু নিজে এনেছেন।'

বলতে বলতে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল।

হীরুবাবু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছিলেন, অন্ধকারে যতটা সম্ভব তাঁর সেই কুঁচচক্ষু বিস্ফারিত ক'রে গাড়িটার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর চিন্তিত মুখে ঘাড় নাড়তে নাড়তে নিজের কোটরে ফিরে এলেন। অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভাল না, ভাল না। রাত্রে এভাবে একা—'

'কি বলছেন ছোট্‌ঠাকুর্দা?' দেবু প্রশ্ন করল।

সে কথার সোজা জবাব না দিয়ে হীরুবাবু পাল্টা প্রশ্ন করলেন,

'হ্যাঁরে, পাবলিক স্টেজ ভাড়া ক'রে যে সব য়্যামেচার ক্লাব প্লে করে, তাদের কি হাউসে সন্ধ্যেবেলায় রিয়েসাল দিতে দেয় ?'

'সত্যি, আপনারই নেশা বটে। থিয়েটার আপনাকে ধরল না, আপনি ধরে আছেন একভাবে। এ ছাড়া কি আর কোন কথা ভাবতে পারেন না ? পৃথিবীতে এত জিনিস আছে, চাঁদে মঙ্গলে লোক পৌঁছে গেল, থিয়েটার টিভিতে দেখাচ্ছে।'

'বল না ছোঁড়া—যা জিজ্ঞেস করছি।'

'ঠিক জানি নে তো, আমার তো ওসব ঝোঁক নেই। তবে দেবার তো কথা নয়। দরকার হলে তেমন কথা থাকলে শুনেছি দুপুরে দেয়। সন্ধ্যেবেলা তো ফি-দিনই কোন না কোন অ্যামেচার ক্লাবের ফাংশান থাকে, ঐতেই তো ওদের আসল লাভ। আর এ শুনেছি ছ'মাস আগে থেকে বুক করতে হয়।'

'হুঁ। ঠিক বটে, ঠিকই তো। আমিও তো তাই জানি।'

বলতে বলতে কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ। একটু পরে বলেন, 'দেবু ভাই, অনেক তো দয়া করিস—আজ একটা টাকা দিবি ? বড্ড দরকার।'

'তা দোব, কিন্তু এখন কোথাও বেরুবেন নাকি ?'

'হ্যাঁ রে, একবার সেই মন্টুর কাছে যাবো।' বাস ভাড়ার জন্যে নিচ্ছি টাকাটা। সব যদি না লাগে বাকীটা ফেরত দেব। ফরডাইস লেনে বাড়ি, কিন্তু এমন সময় কি আর বাড়ি থাকবে ? অন্য কোথায় গেছে জানলে সেখানেও ধাওয়া করতে হবে। তোরা খেয়ে নিস দাদা, আমার খাবার ঐ ভাঙা গামলা ঢাকা দিয়ে রাখতে বলিস।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি, তাঁর কাছেই বা যাবেন কেন এত রাত্রে—হঠাৎ ?'

'সাপের রোজা চাই। কেউটের বিষ বড় সাংঘাতিক, রোজা পেতে দেরি হলে আর বাঁচানো যাবে না।'

এ ক্লাব ও ক্লাব যতই যাতায়াত করুক—গাড়িতেই করেছে। রাস্তাঘাট খুব ভাল চেনে না নীলা। বিশেষ রাত্রে তার কেমন ধাঁধা লাগে বরাবরই। তবু অনেক পথ যাচ্ছে সেটা স্পষ্ট, অনেকক্ষণ চলছে গাড়িটা। মোটামুটি এটা জানে যে রসা রোড দিয়ে গিয়ে টালিগঞ্জের রেলের পুলের নীচে গিয়ে ডান হাতি একটা রাস্তা ধরতে হয় নিউ আলিপুর যেতে।

তাই গাড়ি গড়িয়াহাট দিয়ে গিয়ে ঢাকুরিয়া ব্রীজে উঠতে সে চঞ্চল হয়ে উঠল। এ ব্রীজ সে চেনে, যাদবপুরে তাদের এক আত্মীয়া থাকেন। বাবার সঙ্গে বার দুই এসেছে।

'এদিকে কেন এলেন ড্রাইভারজী, এটা তো যাদবপুরের পথ।'

'যাদবপুর কেন, এ পথ বহু দূর গেছে। সেখানে আমরা যাবো না। আনোয়ার শা রোড দিয়ে গিয়ে টালিগঞ্জের পথে পড়বো, এই রকমই বলা আছে।' সংক্ষেপে উত্তর দিল ড্রাইভার।

'এত ঘুরে?'

'না, ঘুর তো খুব নয়। ওদিক দিয়ে রসা রোডে পড়লে আরও দেরি হত। তা ছাড়া সে ভদ্রলোক হয়ত এই পথেই কোথাও অপেক্ষা করবেন।'

কিন্তু আনোয়ার শা রোড দিয়ে সোজা টালিগঞ্জের রাস্তায় না পড়ে হঠাৎ ডান দিকের একটা পথে ঢুকে পড়ল ড্রাইভার। অস্ফুট কণ্ঠে একটা একটা কটূক্তি করল বোধ হয়।

নীলা অত বুঝল না। তবে একটা জিনিস ওর চোখে পড়েছিল—কিছু দূরে পথের ঠিক মাঝখানে একখানা গাড়ি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হেড লাইট নেই, রাস্তায় আলো তো এদিকে বেশির ভাগই অনুপস্থিত—বাল্‌ব্‌ চুরি এখানে নিয়মিত ঘটনা—তবু দুটো লাল আলোর অবস্থান দেখেই বোঝা যায়, গাড়িটা খুব ছোট নয়।

নীলা ঠিক বুঝতে পারল না ব্যাপারটা; অথবা বোঝার অবসরও পেল না। টালিগঞ্জের পথ সে চেনে না। তবে ড্রাইভারকে একটা কটূক্তি করে

হঠাৎ ডান দিকে মোড় নিতে এটা বুঝেছে যে সে কোন কারণে ভয় পেয়েছে। কিন্তু কি হয়েছে প্রশ্ন করার আগেই সে একটা মাঠের ধারে অন্ধকার জনহীন রাস্তায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে কোন কথা না বলে নেমে প্রায় চোখের নিমেষে পাশের ঝোপটায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবার নীলা দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গেল। এ পাড়া সে চেনে না, এ পথও না। কাছাকাছি কোন বাড়ি নেই। একটু দূরে দূরে যে সব বাড়ি, সেখানের কোন কোন জানলায় আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু বাইরে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। সে একা এতগুলো টাকা নিয়ে কি করবে এখন? কেউ যদি এসে জিজ্ঞাসা করে সে কোথায় যাচ্ছিল? কার কাছে? তাও তো বলতে পারবে না। এতগুলো টাকা—কার টাকা, কাকে দিতে হবে—এ প্রশ্ন যদি ওঠে? বিমলবাবুর নাম করলে তিনি বিপদে পড়বেন, অথচ সে-ই বা কি বলবে? এমন অবস্থা ঘটবে জানলে সে কি আসত? এখন উপায়? তাঁদের বিশ্বাসী ট্যাক্সিওলা, সে-ই বা এমন পাগলের মতো গাড়ি থেকে নেমে পালাল কেন? নিশ্চয়ই কোন ভীষণ রকমের বিপদ আসন্ন। সেও কি এই পথ ধরবে? কিন্তু কোথায় পালাবে, মেয়েছেলে—পালাবার চেষ্টা করছে, সে তো অপরাধের লক্ষণ বলেই গণ্য হবে। তা ছাড়া অল্পবয়সী মেয়েছেলের যে আরও অনেক বিপদ।

এতগুলো চিন্তা—কিন্তু প্রায় দু'-তিন মুহূর্তের মধ্যেই যেন মনের মধ্যে দিয়ে খেলে গেল। পালাবার ইচ্ছা সহজাত—প্রথমতঃ নানান বাধা, দ্বিতীয়তঃ তখন হাত-পা ভয়ে অবশ হিম হয়ে গেছে, গাড়ির দরজাটা খোলারও বোধ হয় শক্তি নেই।

অবশ্য প্রয়োজনও হ'ল না। সেই এক মিনিটের মধ্যেই দু' দিক থেকে দুটি বড় ধরনের গাড়ি এসে দাঁড়াল। জনকয়েক লোক—আধা-অন্ধকারে মনে হ'ল পুলিসের পোশাক পরা—গাড়ি ভাল করে থামবার আগেই তারা লাফিয়ে পড়ে ছুটে এল ওর গাড়ির দিকে এবং তাদের মধ্যে একজন একটা কি জিনিস—বোধ হয় একেই রিভলবার বলে—

সোজা ওর দিকে তুলে ধরে বলল, 'হ্যাণ্ডস্ আপ—হাত দুটো উঁচু করুন!' আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গোটা দুই বড় টর্চের আলো এসে পড়ল ভেতরে, ওর মুখে।

'ও হরি! স্যার, এ যে মেয়েছেলে!' একজন বলে উঠল।

'জানি, এই রকমই ইনফরমেশন ছিল। কিন্তু মেয়েছেলেকে এত নিরীহ ভাবছেন কেন? এই ডোপ লাইনে—শুধু তা কেন, ক্রাইমের দ্বারা উপার্জন করতে আসে যে সব মেয়ে—তারা এক একটি বাঘিনী আর সাপিনী কমবাইনড্, তা জানেন না?'

নীলা চমকে উঠল। না ভয়ে নয়—ভয়ে অনড় পাথর হয়ে গিয়েছিল; ঘেমে নেয়ে উঠেছিল এক মুহূর্তের মধ্যে—এত বিপদ, আসন্ন মহা সর্বনাশের মুখেও বিস্ময়টাই তার প্রবল। এ কার গলা? এ যে তার চেনা, খুব চেনা। মনের একটি বিশেষ তারের সঙ্গে এই গলা সঙ্গীতের মতোই জড়িয়ে আছে। জীবনে ঐ প্রথম এমনি একটা কণ্ঠস্বর তাকে মুগ্ধ, আনমনা করে দিয়েছিল কোথায়—এই মাত্র ক'দিন আগে!

ভাল ক'রে ভাবারও যে সময় মিলল না—তা নইলে হয়ত তখনই মনে পড়ে যেত নিজে থেকেই। তার আগেই সেই রিভলভারী লোকটা বাঁ হাতে দরজা খুলে গাড়ির আলোটা জ্বেলে দিল এবং সেই আলোতে দু' জনেই দু' জনকে চিনতে পারল—হীরক ব্রহ্মচারী, পুলিসের মতোই কি একটা ইউনিফর্ম পরে রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে।

এই গত ক' মিনিটের ঘটনার সবটাই স্বপ্ন, অবিশ্বাস। সে যেন সিনেমা দেখছে কোথাও বসে।

আচ্ছা, এটাও একটা নাটক নয় তো? কিংবা কেউ দূর থেকে ফিল্ম তুলছে না?

এই সব এলোমেলো পাগলের মতো অর্থহীন বিক্ষিপ্ত চিন্তার মধ্যেই শুনল, হীরের ছুরির মতোই যেন কেটে চিরে দিয়ে গেল ওকে কথাগুলো—'ও, আপনি!···আমি আপনাকে সেদিন দেখে প্রথমটায় ভেবেছিলুম, ভীতু ভীতু, লাজুক—ভদ্রঘরের ভদ্র মেয়ে, এসব আবহাওয়ায় এখনও

মানিয়ে নিতে পারেন নি। এমন কি অভিনয় দেখতে দেখতেও মনে হয়েছিল বুঝি আপনার মনের কথাই বলছেন!...শুনেছি বটে যে মেয়েদের চেনা খুব শক্ত কিন্তু এত শক্ত তা ভাবি নি। আশ্চর্য, কি মিথ্যা ইগোই না আমরা পোষণ করি, কি বৃথা বুদ্ধির অহঙ্কার।...যাক গে, সে মালটি কোথায়? ও, এই যে, ওহে রায়, এই পাশেই আছে স্যুটকেসটা। ...এর চাবি কোথায়?' কঠিন রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করল হীরক।

এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল নীলা। আশ্চর্য, এই মহা বিপদের মধ্যেও বসে বসে কি একটা তুচ্ছ কথাই না ভাবছে! ভাবছে এই লোকটাকে সেদিন সাধারণ ভদ্র পোশাকে যত সুন্দর দেখাচ্ছিল, আজ ইউনিফর্ম পরে কি তার চেয়েও বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে? না সেই রকমই?

প্রশ্নের কর্কশ ভঙ্গীতে যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে এবার।

শান্ত কণ্ঠেই বলল, 'জানি না।'

সহজভাবেই বলবার চেষ্টা করল কিন্তু বোধহয় ভয়ে আর কান্নায় গলাটা কেঁপে গিয়ে থাকবে, প্রদীপ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'বা গলাটা বেশ চমৎকার ক'রে নিয়েছেন তো! আপনি সত্যিই ফিনিশড্ আর্টিস্ট। ...তবে এটা বৃথা অপব্যয় হচ্ছে—এই শক্তিটা।...চাবিটা সহজে দেবেন, না জোর ক'রে কেড়ে নিতে হবে? মেয়েছেলে বলে এরা রেহাই দেবে না কিন্তু—'

এবার আর চোখের জল বাধা মানল না। নীলা আকুল হয়েই কেঁদে উঠে বলল, 'সত্যিই বলছি, বিশ্বাস করুন। চাবি আমার কাছে নেই, আমাকে আর এক ভদ্রলোক এটা দিয়ে পাঠিয়েছেন, কাকে কোথায় দিতে হবে তাও জানি না—সবই নাকি ড্রাইভার জানত, বলে দেওয়া হয়েছিল যে সে বাড়িতে গাড়ি পৌঁছলে যে ভদ্রলোক এর চাবি এনে দেখাবেন, তাঁকেই এটা দিতে হবে। নিউ আলিপুরে যাবার কথা, হঠাৎ ড্রাইভার কেন যে এমন ক'রে গাড়ি এখানে এনে আমাকে ফেলে পালাল তা জানি না—'

'গল্পটা বড্ড জলো হয়ে গেল না? বড়ই ছেলেমানুষী? ইভন্ একটা

বাচ্চা ছেলের পক্ষেও বিশ্বাস করা শক্ত। অন্য কিছু ভাবুন, বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প।'

হীরকের সেই বলার ভঙ্গী, যা চামড়া কেটে ভেতরে গিয়ে পৌঁছয়।

রায় বলে যাকে সম্বোধন করা হয়েছিল, সেই অফিসারটি বলে উঠল, 'এ স্যুটকেসে কি আছে আপনি জানেন ?'

'জানি। বলেছিলেন—টাকা আছে, ছ' হাজার টাকা।'

অকস্মাৎ হা হা ক'রে হেসে উঠল ছ' তিনজন, আর প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই হীরকের চাপা গলা যেন গর্জে উঠল, 'শাট আপ! এত হাসির কিছু নেই।...এ টাকা দিয়ে কে পাঠিয়েছে আপনাকে ?'

এবার হাত জোড় করল নীলা, 'দেখুন সেটা দয়া ক'রে জিজ্ঞাসা করবেন না। আমার উপকারী লোক, বলেই দিয়েছেন, এ টাকাটা পাঠাচ্ছেন একজনকে ঘুষ দেওয়ার জন্যে, জানাজানি হলে ওঁর ব্যবসা নষ্ট হবে, তাঁর চাকরি যাবে। আমি মেয়েছেলে নিয়ে এলে কেউ সন্দেহ করবে না তাই—'

'তাই আপনি জেনে শুনে এত বড় একটা গর্হিত কাজ করতে রাজী হয়ে গেলেন ?' বাধা দিয়ে বলে উঠল হীরক, 'একটা অফিসারকে ঘুষ দেওয়া—সম্ভবতঃ কোন চোরা কারবারের সুবিধের জন্যে, জেনেও আপনি নিয়ে যাচ্ছিলেন ?'

'আমি—আমি বড্ড অসহায় হীরকবাবু, তাঁর কথা যদি না শুনি, আমাকে তিনি অনেক রকম বিপদে ফেলতে পারেন। আমার জীবন সত্যিই নাটকের ঐ মেয়েটার মতো।'

'খুব ভাল একটা লাইন পেয়ে গেছেন, না ?—ডিফেন্সের ? আর আমিই সেটা যুগিয়ে দিয়েছি সেদিন। খুব চালাক আপনি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটায় কি আছে জানেন ? না জেনে নিয়েছেন, তা আমি বিশ্বাস করছি না—তবু বলছি, ছ' হাজার নয়, আছে লাখখানেক টাকার মাল, হয়ত বেশীই হবে—এমন সাংঘাতিক নেশার উপকরণ, অন্ততঃ একশোটি তরুণ-বয়সী হীরের টুকরো ছেলে বা মেয়েকে সাংঘাতিক

নেশা ধরিয়ে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এরা সৎপথে থাকলে কত লোকের উপকার হ'ত, দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারত। আপনি শুধু চোরা-চালানের কারবারে সহায়তা করছেন না, কতগুলো ফ্যামিলির সর্বনাশ করছেন, তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন, তা ভেবে দেখেছেন কি এ ব্যবসায় নামার আগে?' কঠিন, নির্মম হয়ে ওঠে হীরকের কণ্ঠ।

'কি বলছেন আপনি! না, না, এ হতে পারে না। তিনি বেশ সম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত লোক—ব্যবসার সুবিধের জন্যে ঘুষ অনেকেই দেয় শুনেছি, সেটাও অপরাধ—তবু এত ঘৃণ্য কাজ তিনি করবেন না।'

'ওহে সান্যাল, খোলো তো স্যুটকেসটা। তারপর উনি কি বলেন দেখি। কিন্তু তোমরা সবাই এখানে কেন, ড্রাইভারকে ছাখো, সে পায়ে হেঁটে আর কত দূর যাবে? তাকে ধরা দরকার, হি নোজ দ্য বিজনেস অল রাইট।'

এর মধ্যেই সান্যাল নামধারী অফিসারটি একটা কি যন্ত্রে স্যুটকেসের চাবি খুলে ডালাটা তুলে ধরলেন, নীলাও চেয়ে দেখল—হেরোইন, মারি-জুয়ানা, হাশিস,—এ সব নাম কাগজে পড়েছে; চরসের নাম তো শুনে এসেছে ছোটবেলা থেকেই, তার দাদা এ সব নেশা করে—নিজেই বলেছে সে—কিন্তু কোনটাই কখনও চোখে দেখে নি, চেনে না—তবু পাতলা কাগজের তলায় স্তরে স্তরে যে বস্তু আছে, আর যাই হোক তাকে কোনমতেই টাকা অর্থাৎ নোট বলা চলে না।

স্তম্ভিত নীলার আড়ষ্ট গলা দিয়ে কোন স্বরই বেরোল না, সে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে বসেই রইল শুধু। নিজের সর্বনাশের পরিমাণ ভাবার মতো, বোঝার চেষ্টা করার মতো ক্ষমতা আর তার ছিল না।

গাড়ির আলোর সঙ্গে আরও দুটো টর্চ ধরাই ছিল, নীলার বিহ্বল অসহায় অবস্থা চোখে না পড়ার কথা নয়—সেদিকে চেয়ে হীরকের কি মনে হ'ল কে জানে, অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বলল, 'আমি কিন্তু আপনাকে য়্যারেস্ট করতে বাধ্য হবো। এ সব নন-বেলএবল্ কেস, হাজতবাসও করতে হবে। আপনি জানুন না জানুন, আপনার জিম্মায়

পাওয়া গেছে—এটা তো অস্বীকার করা যাবে না। কাজেই কেউ দিয়েছে তা যদি প্রমাণও হয়, তাতে আপনি কিছু জানতেন না, এটা প্রমাণ করতে পারবেন না। আপনি নেমে আমাদের গাড়িতে আসুন, ট্যাক্সিটাও অবশ্য আমরা নিয়ে যাবো, কিন্তু এতে ক'রে নিয়ে যাবার ঝুঁকি নেবো না। এই সব কেসে অনেক সময় খুব ন্যাস্টি গেম হয় মধ্যে মধ্যে, গুলি ক'রে গাড়ির পাহারাদারদের মেরে গাড়ি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টাও অসম্ভব নয়, তা না পারলে আপনাকেই হয়ত গুলি করল, আপনি বেঁচে না থাকলে তাদের সন্ধান দিতে পারবেন না, যারা আসল আসামী তারা বেঁচে যাবে।'

'না, না, এ কী বলছেন! হাজতে নিয়ে গেলে যে আর জানাজানি হতে বাকা থাকবে না। আর কোথাও কখনও মুখ দেখাতে পারব না, আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন পথ থাকবে না। দোহাই আপনার হীরকবাবু, আপনি দয়া ক'রে আমাকে গুলি করুন—এইটুকু ভিক্ষা দিন আমাকে।'

হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে থাকে নীলা। এ কান্না এতই মর্মবিদারী যে এর সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

'আমি বলছি, আপনি ব্রাহ্মণ আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমার মার দিব্যি ক'রে বলছি, আমি এ সব কিছুই জানতুম না—তবু আমাকে ছেড়ে দিতে বলছি না, এই মুহূর্তে মেরে ফেলুন শুধু।'

হাসল হীরক, কে জানে সে হাসিতে যেন বিদ্রূপ কি তিরস্কার নেই, বরং যেন কোথায় একটু প্রশ্রয়ের আভাসই আছে, 'ছোট ছেলেরা যখন আগুনে হাত দেয়, না জেনেই দেয়—তবু আগুন তাদের অব্যাহতি দেয় না, তাদের হাত পোড়ে ঠিকই। আর আমি আপনাকে মেরে ফেলব—তার পর? আমার অবস্থাটা কি হবে? খুনের দায়ে তো পড়বই, আপনাদের দলের লোক বলে অভিযুক্ত হওয়াও অসম্ভব নয়।'

এই সময়ে দূরে একটা বড় গাড়ি বা জীপ আসার শব্দ শোনা গেল। মুহূর্ত মধ্যে এরা সকলেই সতর্ক ও প্রস্তুত হয়ে গেল, গাড়িটা ঘিরে যে

যার অস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। অফিসারদের যাঁদের বেল্ট-এ রিভলভার আছে—তাঁরা সেগুলো বার ক'রে নিলেন। আবগারি পুলিস কি কাস্টম্স-এর লোককে মেরে মাল ও আটক-কর্মীদের ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া অতি সাধারণ ঘটনা আজকাল, সে জন্যে প্রস্তুত থাকাই ভাল।

হীরকের মুখও গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। তবে তার হাতের অস্ত্র ও চোখের দৃষ্টি এক চুলও নড়ে নি। সে শুধু বলল, 'সান্যাল, বাক্সটা নিয়ে আমাদের গাড়িতে তোল, তুমি পাহারা দাও নিজে।'

একটু আগে হীরকের ধমকে যারা ড্রাইভারকে খুঁজতে বেরিয়েছিল, তাদেরই একজন ছুটতে ছুটতে এল, 'ড্রাইভারকে পাওয়া গেছে স্যার, ওদিকে একটা গোয়ালের মধ্যে ঢুকে গোবরের গাদায় লুকিয়ে ছিল। এদিকে কিন্তু একটা পুলিস পেট্রোল-কার এসেছে, ক্যালকাটা পুলিসের, লালবাজার থেকে তাদের এই গাড়িটার বিবরণ আর নম্বর দেওয়া হয়েছে—তারাও এই গাড়িটা খুঁজছে, এই নাম্বারের ট্যাক্সি।'

'আমাদের ক্রেডিটটা লালবাজার নিতে চায় নাকি?' রায় বলে ওঠে।

এই সব কথার মধ্যেই পেট্রোল-কারের অফিসারটি এগিয়ে আসেন।

'ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

রায়কে রিভলভারটা নীলার দিকে ধরে রাখার ইঙ্গিত ক'রে হীরক এগিয়ে যায় সে ভদ্রলোকের দিকে।

'নমস্কার, নমস্কার। আপনিই তো ইন-চার্জ। আপনারা এসে গেছেন শুনলুম, মাল ধরাও পড়েছে, ভেরী স্মার্ট অফ ইউ। আমরা এসেছি উল্‌টো ব্যাপারে। লালবাজারের ইনফরমেশন—কোন লোক একটি মেয়েকে ফাঁসাবার জন্যে ডেলিবারেটলি হাশিস বা ঐ ধরনের কোন ডোপ দিয়ে পাঠিয়েছে অন্য কোন পল্লীতে—আর এদিকে আপনাদের ফোনে ইনফরমেশন দিচ্ছে। ওআন বিমল দে সরকার এই কাজ করেছে। মেয়েটি তার আশ্রিত, রক্ষিতাও বলা চলে—মানে মেয়েটি অভিনয় করত, সেই সূত্রেই আলাপ, লোকটা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পাকে-প্রকারে সে পথ বন্ধ ক'রে এনে তার আশ্রিত হতে বাধ্য করে। কিন্তু

মেয়েটি ইদানীং বোধহয় অন্য কোন সোর্সে কিছু কাজ পায়—হয়ত সেই ভরসাতেই বা অন্য কারও প্রতি আকৃষ্ট হয়ে লোকটাকে কোলড্ শোলডার দেখাচ্ছিল, সেই জেলাসিতেই এই হাইনাস আয়োজন।'

একটু চুপ ক'রে থেকে হীরক প্রশ্ন করল, 'ইনফরমেশন একজন ফোনে দিয়েছিল এটা ঠিক, কিন্তু সে যে বিমল দে সরকার কি ক'রে জানলেন ?'

'তা বলতে পারব না। তবে কণ্ট্রোল থেকে বলা হয়েছে ডি. সি. ফুল্লি স্যাটিসফায়েড। এই বিমল খুব ধনী এবং ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক। ওর ওপর অনেক দিন থেকেই পুলিসের নজর ছিল—কারণ সে প্রকাশ্যে যে ব্যবসা করে তাতে এত লাভ হয় না—ওর এত য়্যাফ্লুয়েন্সের সোর্সটা খোঁজ করছিল। ওদিকটা ওঁরা দেখছেন—এই মালটা আর ড্রাইভারকে ধরতেই বলা হয়েছে আমাদের—মেয়েটাকে ছেড়ে দিতে।'

হীরক অনেকক্ষণ কি চিন্তা করল, তারপর গাড়ির কাছে এসে দরজাটা খুলে বলল, 'আপনাকে এ স্যুটকেস দিয়ে কে পাঠিয়েছে সে খবর পুলিস পেয়ে গেছে, তার নামে সম্ভবতঃ হুলিয়া বেরিয়ে গেছে এতক্ষণে। ড্রাইভারকেও পাওয়া গেছে, সে নিজের জান বাঁচাতে সত্যি কথাই বলবে, কে ভাড়া করেছে কি বলেছে সবই—এর পর আর আপনার গোপন করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। পাঠিয়েছিল বিমল সরকার তো ? আপনার—আপনার সঙ্গে একটু অন্য সম্পর্ক ছিল, তাই না ? ঐ যা বলছিলেন—সেদিনের নাটকের মতো—?'

নীলা তখনও কাঁদছে, এবার নীরবে, কিন্তু চোখের জলের বিরাম নেই। মনে হচ্ছে তার বুক ফেটে সমস্ত ব্যথা বেদনা অশ্রুর আকারে বেরিয়ে আসছে। তার বুকের কাছের জামা, শাড়ির সামনের দিক সে কান্নায় আর ঘামে ভিজে উঠেছে—উদ্ভ্রান্তর মতো অবস্থা। সে অনেকক্ষণ বিহ্বলভাবে হীরকের মুখের দিকে চেয়ে থেকে ভাঙা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, তাই। যিনি আমাকে জেনে শুনে এই জঘন্য ব্যাপারে জড়িয়েছেন তাঁর নাম গোপন করার আর দরকার নেই। কিন্তু এর তো

কোন প্রমাণ নেই, আমার কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে ?' শেষের দিকে কেমন এক রকম অসহায়ভাবে প্রশ্ন করে।

'বিশ্বাস না করার অবশ্য কোন কারণ নেই,' হীরক গাড়ির দরজাটা খুলে হাতটা বাড়িয়ে বলল, 'আসুন, নেমে আসুন। একটু হাওয়ায় এসে দাঁড়ান। ইস, আপনার কি অবস্থা হয়েছে। অজ্ঞান হয়ে যাবেন যে!...বিশ্বাস করবে, কেন-না জানা গেছে আপনাকে পাঠিয়ে বিমল-বাবুই ফোন ক'রে জানিয়ে দিয়েছে যে আপনি এই জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন, আপনি এই কাজই করেন, বিরাট গ্যাঙ-এর সঙ্গে জড়িত, কোন্ গাড়ি, কত নম্বর, কোন পথে যাবেন—সব। আমরা একটু এগিয়ে আসাতেই ড্রাইভারের অসুবিধা হয়ে গেছে—মনে হয় ওর ওপর ইন্‌স্টকশ্যন ছিল কোন একটা জায়গায় এসে গাড়ি খারাপ বলে সরে পড়বে, অথবা একে-বারেই ন্যাকা সাজবে যে সে কিছু জানে না। পালাবার চেষ্টা কেন করল সেটাই বুঝতে পারছি না—'

এই বলে একটু থেমে বলল, 'তবে আমাদের আইনে বলে, বমাল ধরা হয়েছে, নিয়ে গিয়ে লক্-আপে রাখতে হবে। ছাড়া যাবে কি না, কি প্রমাণ সাক্ষী আছে—সে বিবেচনা অপরে করবেন, ছাড়া পাবে কি না হায়ার অফিসার বুঝবেন, নইলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে জামিন নিতে হবে, সে কাল দুপুরের আগে নয়।'

আবারও আছড়ে পড়ল নীলা হীরকের পায়ের ওপর, জুতোর ওপরই মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, 'আপনি কোনমতে আমাকে মেরে ফেলুন হীরকবাবু, দয়া করুন। আমার একটুও বাঁচতে ইচ্ছে নেই। বলবেন, আমি পালাবার চেষ্টা করেছিলুম, বলবেন আপনাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলুম —যা হয় বলবেন। আমাকে শুধু অব্যাহতি দিন এ জীবন, এ জন্ম থেকে। জীবনে অনেক পেলাম, অপমান আর লাঞ্ছনা আঁজলা পুরে, এ দেহটাই নরক হয়ে গেল—তাও তাতে পেট ভরল না, আরও কি অদৃষ্টে আছে তা আর দেখার সাধ নেই। আপনি রেহাই না দিলে আমাকে নিজের গলা নিজে টিপে মরতে হবে, নয়ত মেঝেতে মাথা খুঁড়ে।'

'আরে আরে, এ কী করছেন, ছি ছি!' ব্যস্ত বিব্রত হীরক কিছুটা ইতস্ততঃ ক'রে তুলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে, 'উঠুন, উঠুন, ঠাণ্ডা হোন। আইনে যা আছে তাই বললাম। আমি তো একা নই, এতগুলি ভদ্রলোক আছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ আছে, ফ্যামিলি, প্রমোশনের কথা ভাবতে হবে—তাঁরা মিথ্যে সাক্ষী দেবেন কেন! তবু—উঠুন তো, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ!'

পেট্রোল-কারের অফিসারটি এসে আবার খবর দিলেন, 'স্যার, ডি. সি. আপনাকে অনুরোধ করতে বললেন, আপনি যদি দয়া ক'রে এই মেয়েটিকে নিয়ে একবার লালবাজারে যান, আপনার সঙ্গে এই কেসটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চান কমিশনার। বিমলবাবুর খোঁজ করা হয়েছিল, তিনি নাকি রাত্রের প্লেনে বোম্বে চলে গেছেন। অবশ্য সেখানে মেসেজ গেছে, এতক্ষণ সম্ভবতঃ তাঁকে আটক করাও হয়ে গেছে।'

শুনতে শুনতে হীরকের মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই ধরনের হস্তক্ষেপ তার ভাল লাগে না। অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের রূঢ় ভাষাও তার মুখে এসে গিয়েছিল—কিন্তু কি ভেবে সেটা সামলে নিল, বরং যেন একটা সমস্যা সমাধানের পথ পেয়েই তার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। নীলাকে বলল, 'চলুন তাহলে, অপাততঃ লালবাজারেই যাই। মনে হচ্ছে তেমন প্রভাবশালী মুরুব্বীর অভাব হয় নি আপনার, এ যাত্রা হয়ত হাজতবাসটা বেঁচে যেতেও পারে।' তারপর একটু হেসে বলে, 'দেখা যাচ্ছে আপনার শত্রু যতটা প্রবল, মিত্র তার চেয়ে কম নয়।'

ছয়

কমিশনারের আপিসঘরে ঢুকতেই যে মূর্তিটি নীলার প্রথম চোখে পড়ল তা হ'ল একটা ময়লা পাজামার সঙ্গে ফরসা শার্ট পরা হীরুবাবু। যা হাতের কাছে পেয়েছেন তাই পরেই বেরিয়েছেন, তুটোই সম্ভবত দেবুর দাদার।

আর দুটি সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক ছিলেন, মণ্টুবাবুকেও দেখা গেল—কিন্তু তাঁরা কেউ-ই এ আপিসের সঙ্গে এমন বেমামান নন বলেই সর্বাগ্রে হীরুবাবুর দিকেই চোখ পড়ে।

'এসেছিস দিদিভাই!···তোকে বলি নি যে লোকটা সাপের মতো হিসহিসিয়ে ওঠে, অন্ধকারে চোখ জ্বলে—সাক্ষাৎ জাত সাপ! এখন দেখছি গোখরোও নয়, একেবারে কালকেউটে! তবে এও বলব দিদি, লোকটা তোকে সত্যিই ভালবেসেছিল। পয়সা আছে, সোন্দর মেয়ে ঢের জুটত—তোর তো তেমন কিছুই নেই, কী দেখেছিল কে জানে, বোধহয় তুই মন ভোলাতে চাস না বলেই লোকের মন ভোলে। সত্যি ভাল না বাসলে মানুষ হিংসেয় এমন হিতাহিত জ্ঞান হারায় না। এ-খেলা খেলতে গেলে যে নিজে ধরা পড়বেই, যোগাযোগ বেরিয়ে পড়তে বাধ্য—তাও একবার ভাবল না! অত সাংঘাতিক লোক বেকুব হয়ে গেল! আশ্চর্য!'

তারপরই বিস্মিত হীরকের দিকে চোখ পড়তে বলে উঠলেম, 'বোধ হচ্ছে আপনিই হীরকবাবু, না? দিদির মুখে শুনেছি আপনি নাকি খুব ভাল অভিনয় করেন, একবার পার্টটায় চোখ বুলিয়েই নেমে গেছলেন, প্রম্পটিং পর্যন্ত শুনতে হয় নি। বা বা। বেশ। বড় আনন্দ হ'ল শুনে। যা চেহারা আপনার, যা শক্তি—এ-লাইনে এলে কালে দানীবাবু শিশির ভাদুড়িকে ছাপিয়ে যাবেন। এই বিদঘুটে চাকরি, যত রাজ্যের হাড়-বজ্জাতদের পেছনে ঘুরে বেড়ানোর কাজ ছেড়ে দিন—সোজাসুজি অভিনয়ে নামুন। যদি মদটা না ধরেন—আপনার পয়সা খায় কে! ঐ যে সেকালে সত্যেনবাবু ছিলেন, উনি যতদূর মনে হচ্ছে কাস্টম্‌সে কাজ করতেন, য়্যামেচার হয়ে ঢুকেছিলেন। সিরাজদ্দৌলা—না মিরকাসিম?—নাটকে দৌবারিক না দূতের পার্টে ক্ল্যাপ পেয়েছিলেন। তার পরই সরকারী চাকরি ছেড়ে দিলেন, খুব রূপবান পুরুষ—এই সেদিনও আত্মদর্শনে কাম-এর পার্ট করেছেন। তাঁর জন্যে প্রেকাশী তারকেশ্বরে ধন্না দিয়েছিল, পেয়েও ছিল অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত।'

অপিস-কর্তা এবার বাধা দিতে বাধ্য হলেন, গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে হীরুবাবু—এঁরা সকলেই ক্লান্ত, কাজের কথাটা আগে সেরে নেওয়া ভাল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—অবিশ্যি। বিশেষ দিদির ওপর দিয়ে যা ধকল গেল।… বুড়ো মানুষ তো, তায় বেকার, বকতে শুরু করলে আর জ্ঞান থাকে না।' এই বলে তিনি চুপ করলেন।

নীলা উপর্যুপরি আঘাতে অকস্মাৎ কতকগুলি অবিশ্বাস্য ঘটনা ও বিপদের মধ্যে পড়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল কেমন—কিছুই আর ওর মাথায় ঢুকছিল না। তবু, এই আচ্ছন্ন অবস্থাতেই—এটা বুঝল যে এ অবশ্যম্ভাবী জেল হয়ত বা মৃত্যু থেকে—তার চেয়েও বড় কথা কদর্য দুর্নাম থেকে উদ্ধার করতে—সে যে এ ঘৃণ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত নেই, এটা প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে হীরুবাবুর কৃতিত্বই সমধিক।

সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর বালি বওয়া, চটক পাহাড় তৈরীতে চড়াই পাখির কৃতিত্ব—এসব উপমা কদিন আগেই কে দিয়েছিল না?…হীরু-দাদাই তো। সত্যিই উনি কাজে লাগলেন ওর—কাঠবেড়ালী কি চড়ুইয়ের মতো নয়—অনেক, অনেক বেশী।

চেয়ে দেখল হীরুবাবু কুৎকুতে দুটি চোখে ওর দিকে চেয়ে মিটিমিটি ধূর্তের হাসি হাসছেন, সে দৃষ্টিতে কৃতিত্ব ও গর্ব গোপন থাকছে না। ছোট ছেলেরা কোন শক্ত কাজ করতে পেরে যেমন বাহাদুরীর ভাবে অভি-ভাবকদের দিকে চায়—তেমনি।

কানে গেল কমিশনার বলছেন, 'দেখুন হীরকবাবু, আপনারা ধরেছেন, এর দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনাদের ডিপার্টমেন্টের। তবে এঁরা—এই হীরুবাবু, উনি বহুদিনের নামকরা ইয়ে—য়্যাক্‌টার, উনি মৃণালবাবু, এঁরা মেয়েটিকে ভাল ক'রে জানেন—বেচারী বড় সরল আর ভদ্র, তেমনি ভীতুও। সেই স্বভাবের সুযোগ নিয়েই বিমল সরকার বহুদিন ধরে "বুলী" ক'রে আসছে। সেটা এঁরা দেখেছেন। ইনি একজন এম. এল. এ.—যদিও ওঁর কনস্টি-টিউয়েন্সী কলকাতার বাইরে পড়ে—চব্বিশ পরগণায়—তবু ইনি এই

মৃণালবাবুকে দীর্ঘ দিন জানেন, ওঁদের সততা সম্বন্ধে গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে এঁরা মিথ্যা কথা বলছেন না। এঁদের সকলেরই অনুরোধ মেয়েটিকে হাজতে রাখা থেকে অব্যাহতি দিন। দরকার হলেই নীলা আদালতে হাজির হবে, এঁরা তার জন্যে জামিন থাকছেন। ··সবই খুলে বললাম, আমারও যা ইমপ্রেসন হ'ল এঁদের কথা থেকে—অবস্থাবিপাকে ফ্যামিলিকে বাঁচাতে পাঁকে পড়তে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু মেয়েটি থরোলি ভদ্র। আপনাকে আমি জোর করতে পারি না, অনুরোধ মাত্র করতে পারি।'

প্রায় দু-তিন মিনিট মৌন রইল হীরক, কী ভেবে একবার ক্যালেণ্ডারের পাতার দিকে তাকাল—কোনও তারিখ দেখল কিনা ঠিক বোঝা গেল না—তারপর বলল, 'দেখুন আমার এ-লাইনের অভিজ্ঞতা খুব বেশী দিনের নয়, তবে যেটুকু বুঝেছি—এ মেয়েটি নির্দোষ, টাকা জেনেই এনে ছিল, তাও ঐ বিমল সরকারকে ডিসওব্লাইজ করতে সাহস করে নি বলে। আমারও ওকে হাজতে নিয়ে যাবার এমন কোন ইচ্ছা নেই। হাউএভার, আইন মতে ওকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, এটাও ঠিক। আপনি যদি দয়া ক'রে একটা চিঠি দেন, অর্ডার বা সরকারী নির্দেশ বলছি না, অনুরোধ ক'রেই দিন—কিছু একটা কারণ দেখিয়ে, ধরুন ওর মায়ের খুব অসুখ, বা ভাই দুর্ঘটনায় পড়েছে বা আর কিছু—তাহলে অন্ততঃ ঘুষ খাওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পাই। এতে বোধহয় আপনার দিক থেকেও খুব অসুবিধা হবে না, অনুরোধ তো সকলেই সকলকে করতে পারে।'

কমিশনার একটু চুপ ক'রে থেকে কি ভেবে একবার এম. এল. এ. ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন, তিনিও—প্রায় অন্যের অদৃশ্যভাবে—ঈষৎ একটু ঘাড় নাড়লেন, অনুমোদনসূচক।

'আচ্ছা তাই দিচ্ছি, হাতে হাতেই নেবেন তো?'

'অবশ্যই। নইলে হাতে হাতে ছাড়ি কী ক'রে? আর ঐ সঙ্গে যদি একটা পার্সোনাল মুচলেকাও টাইপ করিয়ে দেন—আমি এঁর একটা সই করিয়ে নিই এইখানেই!'

'অফ কোর্স' বলে কমিশনার টাইপিস্টকে ডাকার জন্যে বেলের

বোতাম টিপলেন।

এ কি হচ্ছে? এ কি কোন ছায়াছবি দেখছে সে? এ কি স্বপ্ন? না, অকস্মাৎ প্রবল আঘাতের ফলে মাথাই খারাপ হয়ে গেছে? কিছুই যেন বুঝতে পারে না নীলা, উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেয়ে থাকে শুধু।

ওরা যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন রাত একটা বাজে। পথে কোন ট্যাক্সি নেই। এম. এল. এ. নিজের গাড়িতে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁকে যেতে হবে অনেক দূর। এক নিমেষে পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে হীরক বলল, 'চলুন, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন, আমাদের গাড়িতেই পৌঁছে দিই। স্যুটকেস এতক্ষণ আমাদের গুদোম-ঘরে পৌঁছে গেছে—খবর নিয়েছি, অনেকটা নিশ্চিন্ত। অত আর তাড়াও নেই। আপনারা কোথায় কে থাকেন?'

'মৃণাল মানে মন্টু থাকে ফরডাইস লেন-এ, শ্যালদার কাছাকাছি নাবিয়ে দিলেই ও দিব্যি চলে যেতে পারবে, আমি থাকি এই দিদি-ভাইয়েরই নীচের তলায়।'

গাড়ি ছাড়লে অন্ধকারেই চোখ মটকে হীরুবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, মানুষ দেখলুম বটে দিদি, এই হীরকবাবুকে, নাম সাথক। শাল গাছের মতো সোজা, গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতার মতোই নিষ্পাপ। মিথ্যের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে জানে না। কেন ওর কথায় তোর মুখে খই ফোটে, মুখচোখের চেহারা পাল্টে যায়—আজ বুঝলুম।'

নীলা লজ্জায় মাথা নিচু করল। সেটা লক্ষ্য ক'রে হীরুবাবু যেন আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'না মাইরি, বানিয়ে বলছি না হীরকবাবু, এই দিদিটি তো সেই একদিনই দেখেছে আপনার প্লে, কিন্তু সেদিন থেকেই আপনাকে বোধহয় নিত্যি পূজো করে। না, না, এ-চাকরি আপনি ছেড়ে দিন, কি হবে এ-পেঁশের চাকরি ক'রে? থিয়েটারে নেমে পড়ুন, পয়সা যশ দু'হাতে কুড়োবেন। আমি অনেক লোক দেখেছি তো, আপনার মুখ দেখেই বুঝেছি, আপনার মধ্যে আগুন আছে, পাবক—পতঙ্গ

এলে সে-ই পুড়ে মরবে, আপনার আলো নেভাতে পারবে না। পা পিছলে পড়ে যাবার লোক আপনি নন। আর থিয়েটার করা এমন কিছু নিন্দের কাজ নয়—ধরুন গে রবি ঠাকুরই তো কতবার প্লে করেছেন। আমি দেখেছি ওঁর অভিনয়, মনে আছে চার আনা ক'রে ক'রে চেয়ে-চিন্তে টিকিট কেটে ছোটবেলায় এম্পায়ারে বিসর্জন দেখে এসেছি। উনি জয়-সিংহ, দীনুঠাকুর রঘুবীর আর রানু অধিকারী বোধহয় অপর্ণা। ওঃ, সে যে কি য়্যাক্টিং কি বলব। বয়স অল্প তো—মনে হয়েছিল গ্যারিক কি আরভিং এলেও দাঁড়াতে পারত না। আর দেখেছি যৌবনকালে—তপতী, ওঁর বাড়ির উঠোনেই হয়েছিল। তখন দাদা বেঁচে, তিনটে টাকা দিয়েছেল, নবাবী ক'রে দেখেছিলুম। না মশাই, সেলাম! গিরীশ ঘোষকে দেখি নি—তবে যাদের দেখেছি তারা কেউ দাঁড়াতে পারবে না রবিবাবুর কাছে। ঐ তো ভাদুড়ি সায়েব শুনেছি চারদিনই দেখেছেন পর পর, তারপর তো সাউখুড়ি ক'রে নিজেও নামলেন—ছোঃ, পায়ের নখের যুগ্যিও হ'ল না।…না না, আপনি চাকরিটা ছেড়ে দিন নিশ্চিন্তি হয়ে—'

এতক্ষণে মুখ খোলে হীরক, 'নিশ্চিন্ত হয়ে না হোক এর পর চাকরিটা ছাড়তেই হবে বোধ হচ্ছে।'

চমকে শিউরে উঠল যেন নীলা, হঠাৎ সব ভুলে দু হাতে হীরকের একটা কনুই চেপে ধরে বলে উঠল, 'কেন, সে কি আমার জন্যে?'

চাপা গলাতেই প্রশ্নটা করেছিল। ওরা বসে আছে জীপের সামনে, হিন্দুস্থানী ড্রাইভারের পাশে। পিছনে দু জন সিপাহী আর হীরুবাবু। তিনি আপন মনেই বকে যাচ্ছেন, কখনও এদের, কখনও বা সিপাহীদের সম্বোধন ক'রেই; মন্টু নেমে গেছে ইতিমধ্যে হুজুরীমল লেনের মোড়ে—কেউ অত লক্ষ্য করল না।

নিজের অজ্ঞাতেই ঝোঁকের মাথায় হাতটা ধরে ছিল, সচেতন হতেই ছেড়ে দিল, কিন্তু তার মধ্যেই একটা অনুভূতি অজানা অমৃতে তার বুক ভরে দিল—হীরক নিজে হতে তার হাত ছাড়িয়ে দেয় নি—ঘৃণাভরে ছুড়ে সরিয়ে দেয় নি তার সে আবেগ-স্পর্শ।

হীরকও তেমনি মৃদু কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলল, 'কর্তব্যে ত্রুটি আমি সইতে পারি না—নিজেরও না, অপরেরও না। আমরা এই কাজের জন্যে বেতন নিচ্ছি, নিয়ম ভঙ্গ করা মানে বিশ্বাসঘাতকতা। এর পর এ-চাকরি করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। শুধু আমার কাগজপত্র, আমার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে যেটুকু দেরি।'

'এর চেয়ে যে আমার হাজতে যাওয়াও ঢের ভাল ছিল হীরকবাবু, এর পর আমি নিজের কাছে যে মুখ দেখাতে পারব না!'

'হাজতটা কখনও দেখো নি তাই বলছ ঢের ভাল। দেখলে বুঝতে পারতে ঠেলা, গলায় দড়ি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই, নিজের মাথা ঠুকে রক্তপাত করা যায়—মরার মতো ঠুকতে পারা যায় না নিজে নিজে। তাতে শুধু আরও কেলেঙ্কারী বাড়ানোই হয়।'

একটু প্রশ্রয়—সহজে, বোধহয় অজ্ঞাতেই, 'আপনি'টা 'তুমি' হয়ে যাওয়া—সামান্য একটু সস্নেহ সকৌতুক কণ্ঠস্বর—তাতেই চরিতার্থ হয়ে যায় নীলা। তবে সেই সঙ্গেই নিজের দায়িত্ব, নিজের নির্বুদ্ধিতা যেন আরও পাথরের মতো বুকে চেপে বসে।

হীরুবাবু কিন্তু হীরকের কথার গূঢ়ার্থটা বুঝতে পারলেন না, সোৎসাহে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই ছাড়ুন। কি হবে এ-চাকরিতে! আমি বলছি আপনি কালে বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হবেন। গিরীশ বলেছেন, 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়' কিন্তু দেহটা থাকতে? গিরীশ ঘোষ বুড়ো বয়সে শেষ দিন পর্যন্ত সম্মান পেয়ে যান নি! তাই বা কেন, তিনকড়ি, তারা?··· তবে হ্যাঁ, সাধনা চাই। এদের প্রাইভেট লাইফও কি আর ধোয়া তুলসী পাতা ছিল? তা নয়—অনেক পুরুষ এসেছে গেছে—কিন্তু এই জায়গায় ওদের সত্যিকারের সাধনা ছিল।

'এই তো একবার, ১৯২৭ কি ২৬ হবে, য়্যালফ্রেড থিয়েটার ভাড়া ক'রে মিত্র থিয়েটার খুলল। বিশু মিত্তির পাকা জহুরী, জহরতের দাম জানত, বেছে বেছে যত পুরনো আর্টিস্ট নিয়ে এল—ভুনি বোস, তারা, কুসী, নেপা বোস, নরীসুন্দরী—। এদের তো কাজ দিতে হবে। হঠাৎ

একদিন হুম করে "কেষ্টকান্তের উইল" ঝুলিয়ে বসে রইল। ভুনিবাবু কেষ্টকান্ত, কুসী ভ্রমর, তারাসুন্দরী রোহিণী—কেবল গোবিন্দলাল নির্মলেন্দু লাহিড়ী—বলতে গেলে এদের ছেলের বয়সী। ওঃ! পথেঘাটে এই নিয়ে কি হাসাহাসি! মোদ্দা হাসলে কি হবে, ওপনিং নাইটে পুরো তেত্রিশ শো টাকা সেল, বালতি উপুড় ক'রে তার ওপর লোক দাঁড়িয়ে দেখেছে—ত্রিশ টাকা ক'রে আক্কেল সেলামী দিয়ে। ভুনিবাবু সেকেলে শৌখীন লোক, বাড়ি থেকে অম্বুরি তামাক আর গোলাপ জল নিয়ে আসতেন, সেই জলে গড়গড়া ভর্তি হ'ত। কর্তারা বললেন, আমরা গোলাপ জলই দোব—ভুনিবাবু বললেন, "উঁহু, ও আমি জানি তোমাদের —আদ্দেক গোলাপ জল আর আদ্দেক কলের জল দেবে। সেকেলে জমিদাররা অমন তামাক আনলে সবসুদ্ধ ছুঁড়ে মারত হুঁকোবরদারের মুখে"!

'সে তো গেল। কুসীর মুখ মরার আগেও বোধহয় একটু ঢলঢলে ছিল, দূর থেকে অত বেমানান হবে না—কিন্তু তারা! তা তারা কি করলে জানিস? দুপুরে চান ক'রে ভিজে চুলে পান্তাভাত আর ডাব খেয়ে খাটে শুয়ে ঘুমোল, মাথাটা ধারের দিকে রেখে একটু ঝুলনো অবস্থায়। সন্ধ্যের আগে যখন উঠল, মুখটা থমথমে ফুলো ফুলো, গালের সব খাঁজ পুরন্ত হয়ে গেছে। স্টেজে যখন নামল তখন আর চেনা যায় না। এত মাথা ঘামাত সেকালের এই গ্রেট আর্টিস্টরা!

'তারাসুন্দরীকে যে নাট্যসাম্রাজ্ঞী বলা হ'ত—সে শুধু শুধু নয়। আর কথাটা সেকালে এখনকার মতো এত নকড়া-ছকড়া হয় নি। আগে এক তিনকড়ির নামের আগেই ঐ খেতাবটা বসানো হ'ত। তবে এ দু'-জনের মধ্যে কে বড় তা নিয়ে সমানে তক্কাতক্কি চলত। একবার কি হয়েছিল জানিস—'

অনেক আগে জীপ হাউসিং এস্টেটে ঢুকেছে, তবে ফটক থেকে বেশী দূর এগোয় নি। হীরুবাবু বলে রেখেছিলেন সেটা, পুলিসের গাড়ি মিছিমিছি নীলাদের ব্লক পর্যন্ত গিয়ে লাভ নেই, বরং ক্ষতি আছে। যদি

কেউ দৈবাৎ জেগেই থাকে এখনও—গাড়ির শব্দেও জাগতে পারে—এত রাত্রে সরকারী গাড়ি ক'রে নামিয়ে দিয়ে গেল কেন, এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত থাকবে না।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেছে—এবার নামার কথা। ড্রাইভার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, সিপাহীরা ঢুলছে, হীরুবাবু এ-সব তুচ্ছ তথ্য নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন? অপ্রতিভ নালা কথাটা মনে করিয়ে দিতে প্রশান্তকণ্ঠে বললেন, 'অ, এসে গেছি, নামছি—এক মিনিট।

'এই ছোট্ট গল্পটা শুনিয়ে দিই হীরক ভায়াকে, আমি মলে এ-সব কেউ বলার থাকবে না। তখন মিনার্ভার গোল্ডেন ডেজ চলছে, যাকে এখন বলে গৌরবময় যুগ। বড় বড় স্টার, বড় নাট্যকার, গিরীশ ঘোষ তো আছেনই—ডি. এল. রায়, ক্ষীরোদবাবু, অতুল মিত্তির, এ বলে আমায় দেখ—ও বলে আমায়। জি সি.-র চিরদিনই তিনকড়ি-অন্ত প্রাণ, ফিগার ভাল. কাটাকাটা মুখ এতটুকুটি থেকে পাখি পড়ানোর মতো ক'রে শিখিয়েছেন—সব রকম পার্ট লিখে করিয়েছেন ওকে দিয়ে যাতে চৌকশ হয়—লোকে একটু অন্য বদনামও দিত, অবিশ্যি বদনাম আর কি, ওঁদের ও-সব কিছু লাগে না, গঙ্গা জলে আবার ময়লা কি? আর যে কড়ে আঙুলে গোবর্ধন ধারণ করতে পারে তার গোপিনী-বিহারে দোষ হয় না—হ্যাঁ যা বলছিলুম—ওঁর মতে তিনকড়িই বড়, থিয়েটারের মালিকদের মতে তারাসুন্দরী। এই নিয়ে পেরায়ই তর্ক-বিতর্ক হ'ত। হঠাৎ একদিন জি. সি. বললেন, "বেশ আসুন—এক রাত্তিরে দু'খানা বই দেওয়া হোক. যার যা সেরা—দেখি অডিয়েন্স কি ভাবে নেয়।" এখন তিনকড়ির সেরা জনা, তারার রিজিয়া। তা সেই ব্যবস্থাই হ'ল, এক রাত্রে দুটো বই। হ'ল তো প্যাক্‌ড, তিল থোবার ঠাঁই নেই, যাকে বলে বাদুড়ঝোলা। তিনকড়ি বললেন, "আমার প্লে কিন্তু আগে দেওয়া চাই, আমি কাক ডাকা পর্যন্ত বসে থাকতে পারব না।" তারা বললে, "আমাকে যখন দেবেন তখনই করব।" মজাটা দেখুন হীরক ভায়া, জনা হল গিরীশবাবুর লেখা, তায় পৌরাণিক, দানীবাবু, গিরীশবাবু সবাই

নামেন, যাকে বলে অল-স্টার-কাস্ট। আর রিজিয়া কে এক মনমোহন রায়ের লেখা, অভিনয়েও গিরীশবাবু-টাবু কেউ কোত্থাও নেই। জনা আগে জ্বালিয়ে দিয়ে গেলে সে আসরে ঐ খটোমটো দাঁত ভাঙা ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের রিজিয়া নাটকের প্লে কে দেখবে? না মাথা না মুণ্ডু, শুনেছিলুম কে এক স্কট্ ছেলেন খুব বড় ইংরেজ অথর, তাঁরই কি বই থেকে নেওয়া— তা হোক, পড়িলে ভেড়ার সিং-এ ভাঙ্গেরে হীরার ধার। তা তারা কোন দ্বিরুক্তি করল না, পাঁচ ঘণ্টা ধরে জনা হ'ল, এক কোণে চুপটি ক'রে বসে দেখল।

'তিনকড়ির আরও ডাঁট, ওর বই শেষ হতেই বাড়ি চলে গেল। ভাবটা—আমি যা ক'রে গেলুম, তারপর আর মাঠাকরুনকে দাঁত ফোটাতে হবে না। কিন্তু ও মশাই, রিজিয়া যেমন যেমন এগোতে লাগল অডিয়েন্সের সে কি ক্ল্যাপিং কি প্রশংসা! বই যখন শেষ হ'ল তখন কোথায় জনা, জনার ছবি ধুয়ে মুছে গেছে সকলের মন থেকে। জি. সি. মুখ কালো ক'রে এসে তারার পিঠ চাপড়ে বললেন, "বেঁচে থাক বাবা, হ্যাঁ, তোরই শিক্ষা সার্থক"।'

হীরক অসীম ধৈর্যে বসে শুনছিল, এখন বলল—বলতে বাধ্য হ'ল, 'তাহলে আপনাদের কি ব্লক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব?'

'ও, বড্ড দেরি হয়ে গেছে, না? সরি, অন্যায় হয়ে গেছে। রাত তো ভোর হয়ে গেল পেরায়। বুড়ো মানুষের ঐ দোষ, সব ইন্দ্রিয় অকেজো হয়ে এনার্জিটা বকুনিতে গিয়ে পৌছয়। না, আমরাই যাচ্ছি। চল্ দিদি, ওঃ আজ এক দিনই গেল তোর।'

সাত

দুদিন পরে হীরুবাবু এসে খবরটা দিলেন।

সকালে যখন নিঃসঙ্কোচে এসে পাঁচটা টাকা চাইলেন, তখনও কারণটা

বোঝে নি নীলা। সে আগের দিনই দেবুর দাদাকে দিয়ে নতুন পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি আনিয়ে দিয়েছে। পাজামাও কিনতে বলেছিল, অরু রাজী হয় নি, বলেছে, 'আমাদেরই অনেক আছে, উনি ইচ্ছে করলেই পরতে পারেন, পরেনও—আর কি হবে মিছিমিছি ?'

তা সত্ত্বেও কেন টাকার দরকার হ'ল সে প্রশ্ন করে নি নীলা, যাকে যথাসর্বস্ব দিলেও ঋণ শোধ হয় না, সে পাঁচটা টাকা চাইছে এ আর এমন কি কথা ? সে একটা দশ টাকার নোটই বার করেছিল, হীরুবাবু কিছুতে নিলেন না ! মেয়ের মুখে সেদিনের সেই বৃত্তান্ত শুনে নেপেন-বাবুও এখন সম্ভ্রমের চোখে দেখছেন—তিনিও কিছু বেশী টাকা রাখলে দোষ নেই বোঝালেন, হীরুবাবুর সেই এক ঘাড় নাড়া—'আমার তো এমনি কোন দরকার হয় না, দরকার হলেই চেয়ে নেব, একটুও লজ্জা করব না।'

দরকারটা কি পড়েছিল সেটাই বোঝা গেল সন্ধ্যেবেলা।

হীরুবাবু হীরকের খবর নিতে গিছলেন। বিস্তর ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, নিজে বিড়ি খান—আপিসের দরোয়ানকে পুরো এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিতে হয়েছে, এক অফিসারের পায়ে-হাতে ধরতে হয়েছে প্রায়—এ-আপিস ও-আপিস—এই ক'রে খবর বার করেছেন। বহুকাল ট্রামে-বাসে চড়ার দরকার হয় নি, শহরের এ হাল হয়েছে এক আধবার দেখেছেন, এমনভাবে হাড়ে-হাড়ে টের পেতে হয় নি।

এই সব বিবরণ দিয়ে—নীলা যখন প্রায় ধৈর্যের শেষ প্রান্তে পৌছে গেছে, তখন—খবরটি বার করলেন ঝুলি থেকে। হীরক চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে। আজই দুপুরে একজনকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে নিজের কাগজ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে এসেছে।

'বিবেকের সঙ্গে বা অন্তরের সঙ্গে যাই বলো—নিয়মের যুদ্ধে নিয়ম হেরে গিছল। কিন্তু সেখানেও বিবেক হুঁশিয়ার, কর্তব্যের সঙ্গে বোঝা-পড়া তো, আইন বা নিয়মের সম্মানটাও বড় কথা, সেই জন্যেই চাকরি ছেড়ে দিলে।'

নীলার দু'চোখ জলে ভরে এল, 'আমি অভাগী চিরদিন জ্বলে আর জ্বালিয়ে যাবো—বিধাতার এই অভিশাপ নিয়েই জন্মেছি। যা করতে গেছি তাতেই আমার ভাগ্য তাড়া করেছে। আমার সংস্রবে এসেই ওঁর এত বড় ক্ষতিটা হ'ল, আমাকে দয়া করতে গেলেন বলেই। আমি না মলে কারও শান্তি নেই। আমারই গেল-জন্মের পাপের ফল, সারা-জীবন বোধ হয় পাপই করেছিলুম, বারণ করার কেউ ছিল না। আপনি আমার জন্যে এত করছেন—আপনারও না অনিষ্ট হয়।'

'নে দিকি। জীবনের তো সবে শুরু, এর মধ্যেই সব অন্ধকার দেখলি! গেল-জন্মের হিসেব-নিকেশ করতে বসলি এখুনি! গত-জন্ম আসছে-জন্ম মিছে কথা—যার যা গ্রহর ফল, জন্মলগ্নের মাহাত্ম্য! আর পাপ? সেও এই জন্মেই শোধ ক'রে যেতে হয় কড়ায় গণ্ডায়। ঢের দেখলুম, কেউ পরিত্রাণ পায় না। আর আমার অনিষ্ট? ল্যাংটার নেই বাট-পাড়ের ভয়—আমার আর করবেটা কি? ছিয়াত্তর বছর পার ক'রে এলুম, মরবার দিন গুনছি। আসলে কি জানিস, যমও আমাকে নিতে চায় না—পাছে সেখানে গিয়েও থিয়েটারের গল্প শুরু করি কিংবা সেখানের থিয়েটারে চাকরি চাই।'

টাকরার একটা বিচিত্র শব্দ ক'রে খুব একচোট হেসে নিলেন হীরু-বাবু।

অতঃপর দ্বিতীয় সংবাদটি ছাড়লেন।

আজ বিকেলবেলা হারক যখন আপিস থেকে বেরুচ্ছে, কে একজন চলন্ত গাড়ি থেকে গুলি ক'রে পালিয়ে গেছে। ভাগ্যে শেষ মুহূর্তে আড়ে দেখে ফেলেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই সরে যাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তখন আর পুরো সরার সময় ছিল না, মাথা বেঁচেছে, হাতটা তুলেছিল হাতে লেগেছে একটু। তবে সে বিশেষ কিছু নয়—হাতে সামান্য চোটের ওপর দিয়ে বেঁচে গেছে। এদের ধারণা গুলি করেছে বিমল সরকারের লোক।

নীলার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে শুনতে শুনতেই, কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা জমে উঠেছে; সে রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল, 'তার পর?'

'আপিসের লোক তখনই পুলিস হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তা বাধাজী তো কট্টর নীতিবাগীশ এ-সব ব্যাপারে, বলে, "চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, আর সে অ্যাডভাণ্টেজ নোব কেন?" নিজেই ট্যাক্সি ক'রে এসেছিল মেডিক্যাল কলেজে, এমার্জেন্সী থেকে ড্রেস করিয়ে বাড়ি চলে গেছে।'

আবারও কেঁদে ফেলল নীলা, 'কি হবে দাদা, বাড়িতে কে আছে না আছে কিছুই তো জানি না, কে দেখবে? বাড়িটা কোথায় তাও বোধ হয় জানতে পারেন নি?'

'রোসো, রোসো। সেই সকালে বাসি রুটি আর চা খেয়ে বেরিয়েছি—এই ফিরলুম। তোর পাঁচ টাকা পুরো খতম, একবার রিকশাও চড়তে হয়েছে—ওঃ, কী ভাড়া চায় আজকাল বেটারা—তা এই 'পর দিন যে কাটালুম, সে কি অমনি অমনি।'

নীলার মা নিজেই ওঁর ঐ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থা দেখে চা দিয়ে গেছেন—চা আর তার সঙ্গে দু'খানা পরোটা। অন্যমনস্কভাবে খেতে খেতে বললেন, 'হীরকভায়ার কি এক রকম ভড়ং! উনি সরকারি কোয়ার্টারে থাকেন না, সায়েবপাড়া যাকে আমরা বলতুম সেইখানে এক গলির মধ্যে এক কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে থাকেন। শুধু তাই নয়, ঝি চাকর নেই, ঘর মোছা, বিছানা করা, সাবান কাচা সব নিজে করে। তবে একটা সুবিধে, রান্নার পাট নেই তো।'

'তা খান কোথায় তাহলে? হোটেলে?' নীলা ওঁর কথার মধ্যেই বলে ওঠে।

'হু-হুঁ।' হেসে দুলতে দুলতে বলেন, 'যে নিজে সব করে, সে হোটেলে খাবে! সেই বান্দা? তোর বুদ্ধির দৌড় দেখব বলেই তো কথাটা এতক্ষণ ঝোলার মধ্যে রেখেছি, টেনে বার করি নি। সে গুড়ে বালি গো ঠাকরুন, তোমার প্রাণনাথটি রীতিমতো সন্ন্যাসী। ফল আর দুধ খান, শুধু দুধটা—হীটার আছে, তাইতে গরম ক'রে নেন। আর কিছু না, কোন রান্না জিনিস স্পর্শ করে না। ঐ জন্যেই কোয়ার্টার

নেয় নি, পাছে জানাজানি হয়ে যায়, হাজার জনকে জবাবদিহি করতে হয়। ও-পাড়ায় থাকে সেও বোধ হয় ঐ জন্যে, কেউ বাঙালী নেই বলে।'

দুঃখের মধ্যেও আগুনের মতো রাঙা হয়ে ওঠে নীলা, 'যাঃ! কী সব যা-তা বলছেন!'

ধূর্ত চোখ দুটিতে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে যায়।

'ওরে বাবা—আমরা যে দুধটুকু মরে ক্ষীরটুকু শুধু নয়—ক্ষীরটুকু মরে চাঁচি হয়ে গেছি। আমাদের চোখ আর কত এড়াবি!'

'আচ্ছা দাদা, সেখানে আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারেন না?'

'মহাদেবের ধ্যান ভাঙাতে? জানি, জানি, তা যে বলবি তাও জানি। নে যেতে যে হবে তা কি আর জানি নি। নইলে আর এত ছিষ্টি খবর আনলুম কেন! দুটো মিনিট সবুর কর্—তা কেন, তুইও তৈরি হয়ে নে, একটু কিছু মুখে দিয়ে নিস—আমি মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে, দেবুদের একটু বলে এখুনি আসছি।'

এই বলে দ্রুতই নেমে চলে গেলেন। ছিয়াত্তরটা বছরের ভার আর অসংখ্য অনিয়ম অত্যাচার অনাহারের শ্রান্তি—পরোপকারের উৎসাহে যেন কোথায় চলে গেছে।

একটা বিখ্যাত সাহেবী হোটেলের পিছন দিকের কি একটা গলি. আগে পুরো ফিরিঙ্গি-পাড়া ছিল, এখন কিছু মুসলমান, কিছু চীনা, কিছু বা হিন্দু বাঙালী মিলে একটা খিচুড়ি পাড়া হয়ে গেছে। কাছাকাছি অনেকগুলি রেস্তোরাঁ-বার থাকায় রাত্রে অনেক সম্ভ্রান্ত লোককেও ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়, আবার গভীর রাত্রে মাতলামির শব্দ তিন-তলা পর্যন্ত পৌঁছয়। কিছু 'কল-গার্ল'ও ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যার পর থেকে।

এইটেই বোঝাতে বোঝাতে নিয়ে এসেছিলেন হীরুবাবু। শুধু পরিচিত কৌতূহলী লোক এড়াতেই এখানে থাকা—কিংবা আর কোথাও এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ এক কামরার ফ্ল্যাট পাওয়া যায় নি বলেই। অথবা ওর

যা কাজ—তারও কিছু সুবিধে হয় এ পাড়ায় থাকলে। এই সব নেশার জিনিস নিয়ে যারা কারবার করে, তাদের এই রকম পাড়াতে এসেই লেনদেনের যোগাড় দেখতে হয়। এখানে এই দু'বছরই বাস করছে, যত দিনের চাকরি, তত দিন।

সাহেব পাড়ার বাড়ি সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটা যে ধারণা ছিল তা বাড়িতে ঢোকার মুখেই একটা রূঢ় আঘাত খেল। প্রবেশ-পথে বড় একটা ফটকের মতো বোধ হয় ছিল কোন কালে, তাতে কপাট নেই, দুদিকের দেওয়াল বালি ঝরা, নোনা ইট বার করা। রাস্তা থেকেই বলতে গেলে যে কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে—তার রেলিং ভাঙা, সিঁড়ির কাঠও নড়বড়ে আলগা হয়ে এসেছে. চওড়া সিঁড়ি বলেই ওঠা যায় নইলে পড়ে যেত লোকে।

এই সিঁড়ির পিছনে আইন-মতো একটু খোলা জমি বা উঠোন. আছে, তবে তাতে রাজ্যের ভাঙা জিনিসপত্র—গাড়ির ভগ্নাংশ থেকে চেয়ারের ধ্বংসাবশেষ—স্তূপীকৃত, তাতে বহু দিনের ধুলো বালির স্তর পড়ে বর্ষার জলে নানা গাছ গজিয়ে উঠেছে। নিচে কেউ কোথাও নেই, ভাড়া দেবার মতো ঘরও নেই, যতটুকু স্থান বার করা সম্ভব তা নিয়ে দোকান ক'রে দিয়েছেন বাড়িওলা—সিঁড়ির পাশে ঐ উঠোনে একটা খালি খাটিয়া পড়ে আছে, বোধ হয় কোন দরোয়ান বা এই সব দোকানের কেউ শোয়।

সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে একটা অন্ধকার চলন, তার দুপাশে ফ্ল্যাট, সব ফ্ল্যাটেরই দরজা বন্ধ—কোনটা ভেতরে থেকে কোনটা বাইরে থেকে—ফলে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হীরুবাবুর আশ্চর্য আন্দাজ, তিনি নীলার হাত ধরে বিনা দুর্ঘটনাতেই কোণের সর্বশেষ ফ্ল্যাটে পৌঁছলেন।

চলনে আলো দেওয়া কার কর্তব্য—বোধ হয় এই সমস্যার কোন সমাধান না হওয়াতেই কেউ দেয় নি।

কোণের ডান-হাতি ঘর, জানলা রাস্তার দিকে। এদিকে এই একটি

বড় দরজা, ঠেলতেই খুলে গেল। দরজা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে নি কেউ, দেবার মতো বাড়তি কেউ ছিলও না। গৃহস্বামী একাই একটা সঙ্কীর্ণ চৌকির ওপর অতি সামান্য বিছানায় শুয়ে আছে, পাশে ছোট একটা টুলে একগ্লাস জল আর বোধহয় দু-একটা ওষুধ। তবে আলোটা জ্বলছে, সেও বোধ হয় কেউ নেভানোর মতো লোক নেই বলেই।

চোখ বুজেই শুয়েছিল হীরক, দরজা খোলার শব্দে ওদের দেখে চমকে উঠল।

'একি ! আপনি ! এত রাত্রে ! আবার ওঁকে আনলেন কেন ?'

'আরে ! একেই বলে অসংসারী। ওকে কি আমি এনেছি ? ও-ই আমাকে এনেছে। কেঁদে-কেটে কপাল চাপড়ে অনত্থ কাণ্ড একেবারে। ও নাকি চির-অভাগী, ওর জন্যেই আপনার এতগুলো গেরো, চাকরি ছাড়তে হ'ল, গুলি খেলেন—প্রাণটাই হয়ত যেত। এই সব। বুঝলেন না ! এখনও বোধ হয় হিসেব করছেন, উনি নিজে প্রাণ দিলে আপনার এত অনিষ্টের কিছু উশুল হয় কিনা !'

'তা ওকেই বা এসব বলতে গেলেন কেন ? আপনাকেই বা এত কথা কে বললে ?'

স্পষ্ট বিরক্তি হীরকের গলায়।

'ঐ দেখুন। সে একই উত্তর তো। আমাকে চরকির মতো সারাদিন ঘুরিয়েছে এ মেয়ে। এই বুড়ো বয়সে আমি কি সাধ ক'রে ঘুরেছি ! খবর না জানলে মুখে জল দিত ?'

নীলা প্রথমটা একটু কুণ্ঠিত ভাবেই ঢুকেছিল, হীরকের বিরক্তির ভয়টাই সে করেছিল। কিন্তু এখন এই ভাবে ওকে নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব, অসহায় পড়ে থাকতে দেখে যেন আপনিই সব সঙ্কোচ কেটে গেল। সে হীরুবাবুকে এক রকম সরিয়ে চৌকির পাশে এসে হীরকের কপালে হাত দিয়ে বলে উঠল, 'ও মা, এ যে বেশ জ্বর !'

হীরক এবার একটু, ছেলেমানুষের কোন অন্যায় ক'রে ধরা পড়ে

যাওয়ার মতোই, হেসে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, জ্বর একটু এসেছে। আমিও বুঝতে পারছি। এরই তাড়সে বোধহয়। ইঞ্জেকশনের জন্যেও হতে পারে।'

'একটু নয়, বেশ জ্বর। একশো দুই তিনের কম হবে না। তা কেউ যখন দেখবার নেই—তখন হাসপাতালে থাকাই তো উচিত ছিল আপনার।'

'উচিত যা ছিল—তা আপনার কাছে ওঠা—এই তো?' হেসে উঠল হীরক, বলল, 'হাসপাতালের যা বর্ণনা লোকের মুখে শুনি, কাগজেও তো খবর বেরোয়—সে তো আরও নির্বান্ধব অবস্থা, নো ফাদার নো মাদার। ডাক্তাররা উদাসীন, নার্সরা অকর্মণ্য।'

'কী খাচ্ছেন?'

'কিছুই খাই নি এখনও। সকালে দুধ আসে, সে বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে। আর কিছু খেতে ইচ্ছেও করছে না। জ্বরের ওপর কিছু খাওয়া উচিতও হবে না বোধ হয়। আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যান, কাল সকালে জ্বর কমলে দুধ গরম ক'রে খেতে পারব। বাঁ হাতটা তো আছে।'

'আপনি তো ফলই খান। জ্বরের ওপর ফল খেতে তো দোষ নেই।'

বলতে বলতেই নীলার নজর পড়ল কোণে একটা মীট সেফ রয়েছে। বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে এসে সেটা খুলে দেখল—দুধটা সত্যিই প্রায় দই হয়ে গেছে—কিন্তু গোটা দুই মুসাম্বী লেবু, তিন চারটে কলা, একটা আপেলও পড়ে আছে।

হীরক আবারও একটু কুণ্ঠিত ভাবে হাসল।

'আমি যে ফলই খাই—এ খবরও নেওয়া হয়ে গেছে? হীরুবাবু আমাদের লাইনে এলে মোটা টাকা মাইনে পেতেন। এখনও যদি ইনফরমারের কাজটা করেন, অনেক রোজগার হবে।'

'তা মন্দ না', হীরুবাবু এদিক ওদিক দেখে ঘরের একমাত্র চেয়ারখানা টেনে বসে পড়ে বলেন, 'তবে কি জানেন, নিজের জন্যে কখনই কিছু করি নি—এ বয়সে কি আর করা হয়ে উঠবে? এই দিদির মতো

যদি কেউ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, তবেই হতে পারে।'

'আমি তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি?' নীলা ছদ্ম তর্জন করে বলে ওঠে, 'তখন থেকে বেশ যা-তা সব বলে যাচ্ছেন আমার নামে!'

'সব তাড়ানো কি আর চোখে দেখা যায়, যে বুঝদার সে বুঝতে পারে। তোর মুখ চোখের যে চেহারা দেখেছি, তার পরও কি আর চুপ ক'রে বসে থাকতে পারতুম। বুকে হাত দিয়ে বল্ দিকি দিদি—এই খবরের জন্যে ছটফট করছিলি কি না! কাল থেকে প্রায় কিছুই খাস নি সে খবরও আমার কানে পৌঁছেছে।'

নীলা ওঁর কথার কোন জবাব না দিয়ে, হীরকের দিকে একটু ঝুঁকে আস্তে আস্তে বলে, 'আমি তো হাত ধুয়ে ফলে হাত দিয়েছি, লেবু দুটো রস ক'রে দিলে খাবেন না? ঐ সঙ্গে একটু আপেল?'

হীরক এবার ব্যস্ত হয়ে উঠে বসল, বলল, 'আরে, না না, অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। ক্ষিদে পেলে উঠে আমি ঠিক খেয়ে নেব এখন। তুমি বাড়ি যাও, এত রাত্রে এই পাড়ায়—ছি ছি, খুব ছেলেমানুষী করেছ!'

নীলা গম্ভীর মুখে বলে, 'সে জন্যে আপনিও ব্যস্ত হবেন না। রাত্রে ফেরা আমার নতুন নয়। আর লজ্জার কি দুর্নামের ভয়ও নেই, দাদা সঙ্গে আছেন!'

'সে জন্যে নয়, তুমি বুঝছ না, পাড়াটা খারাপ যে। একটু পরে, রাত দশটা বাজলে নরক হয়ে উঠবে একেবারে। তখন বেরুনো একদম উচিত হবে না তোমার পক্ষে।'

'কে বেরুচ্ছে তখন। সকালবেলাই যাবো।' লেবুর রস করতে করতে নিরুদ্বিগ্নভাবে উত্তর দেয় নীলা!

হীরকের উৎকণ্ঠা আর ব্যস্ততার শেষ থাকে না।

'না না, আরে পাগল নাকি! এখানে থাকবে কি। হীরুবাবু, প্লীজ, আপনি ওকে বুঝিয়ে নিয়ে যান। বেশ, ফলটা খাইয়েই যাও, কিন্তু রাত্রে থাকার কিচ্ছু দরকার নেই। তেমন বুঝলে—বন্ধুবান্ধব তো কিছু আছে, আমি তাঁদের খবর দেব। টেলিফোনটা আপিসের অবিশ্যি, কিন্তু

এখনও তো কাটে নি—আমার চোদ্দ দিনের ছুটি পাওনা, সেটাই চলছে—সে পর্যন্ত কাটবে না। অনর্থক ব্যবহার করার ইচ্ছে আমার নেই, তবে দরকার হলে ঠিক করব—এত নীতিবাগীশ আমি নই। হীরুবাবু, প্লীজ—'

হীরুবাবু যেন খুব নিরুপায় আর বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বলেন, 'যে বুঝবে না, তাকে বোঝাবার ক্ষ্যামতা আমার নেই ভাই। তার চেয়ে তুমি লক্ষ্মীছেলের মতো চোখ বুজে শুয়ে পড়ো, দিদিও চোখ বুজে বসে থাক—ল্যাঠা চুকে গেল!'

'না, এমন করলে তো আমাকেই অন্যত্র যেতে হয়!'

একটা কঠিন বিরক্তির স্বর আনার চেষ্টা করে হীরক।

'তা হলে তো বাঁচি!' নীলাও সমানে উত্তর দেয়, 'কোন বন্ধুর বাড়ি কি আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছেন জানলে সঙ্গে গিয়ে সেখানে পৌঁছিয়ে তাদের জিম্মে ক'রে নিশ্চিন্তি হয়ে বাড়ি যাই।' বলতে বলতে লেবুর রস আর আপেল নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

যথেষ্ট উদ্বেগ আর বিরক্তি সত্ত্বেও হেসে ফেলে হীরক, তারপর কতকটা হতাশভাবেই লেবুর রসটা খেয়ে শুয়ে পড়ে আবার। কেমন যেন ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, 'আপেলটা থাক এখন, পরে খাবো বরং—এখন ভাল লাগছে না!' কথাটা বলতে বলতেই চোখ দুটো বুজে আসে তার, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিথর হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

একটু দেখে নীলা চুপি চুপি প্রশ্ন করল, 'অজ্ঞান হয়ে গেলেন না তো?'

হীরুবাবু বললেন, 'না রে, শুনেছি খুব রক্ত বেরিয়েছিল, তাই নিয়েই ঘোরাঘুরি করেছে তো, ব্যাণ্ডেজ করতে তো দেরি হয়েছে—তাতেই বোধ হয় খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। আবার এই এখন এত কথা কইল, উঠে বসল, এতটা উত্তেজনা, সবটা জড়িয়েই—'

আরও কিছু পরে নীলা বলল, 'আপনি কোন ডাক্তার ডাকতে পারবেন দাদা, আমার কাছে কিছু টাকা আছে—তার জন্যে আটকাবে না।'

হীরুবাবু ঘাড় নাড়লেন, 'না ভাই। এ পাড়ার কাউকে চিনি না, ও পাড়ার কোন ডাক্তার কেউ এখেনে আসবে না এত রাত্তিরে।'

কথাটা যে সত্যি, তা নীলাও বোঝে।

এটুকু অভিজ্ঞতা তারও হয়েছে এতদিনে।

সুতরাং আর কিছু করার নেই, অপেক্ষা করা ছাড়া। রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা, বা হীরকের জ্ঞান হওয়ার।

হীরুবাবু চেয়ারে বসে বসেই ঢুলতে লাগলেন। নীলা একেবারে বিছানার পাশে মেঝেতে বসে রইল।

রাত গভীর হয়ে আসছে ক্রমশঃ। নিচে রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ কমছে, মাতালের হল্লা বাড়ছে। নীলা একসময় উঠে হীরুবাবুর কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি কি বাড়ি যাবেন? সারা দিন ঘুরেছেন, খাওয়া হয় নি, বিশ্রাম হয় নি। বরং ভোরে আসবেন?'

'না ভাই, মানুষ তো দেখছিস। সন্ন্যাসী ধাতের লোক। একা তোকে রেখে চলে গেছি জানলে মুচ্ছো যাবে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে নীলা আবার বলে 'ওঁর কে বন্ধু-বান্ধব আছে তা তো জানি না, তবে শিপটনের অজয়বাবুর ভাই ওঁর বন্ধু, এটা সেদিন শুনেছি। কিন্তু তাঁকেই বা খবর দোব কি ক'রে? ফোন আছে কিনা তাও তো জানি না।'

'ঐ শিপটনের আফিস ক্লাবের লোক? মন্টু চেনে নিশ্চয়। দে তো একটা টাকা ভাই, মন্টুর নিজের কোন ফোন নেই, ওর ভাড়াটেদের আছে। যাই, মন্টুকে বলে দেখি—কোনমতে তোর ঐ অজয়বাবুকে খবরটা দিতে পারে কিনা।'

ব্লাউজের মধ্যে থেকে ছোট্ট ব্যাগটা বার ক'রে দু'খানা দশ টাকার নোটই হীরুবাবুর হাতে দিল নীলা, 'আপনি এ টাকা রাখুন দাদা, একটা ট্যাক্সি ক'রে চলে যান, মন্টুবাবুকে সব বুঝিয়ে বলে, যদি সম্ভব হয় আজ রাত্রে কিংবা খুব ভোরে যেন এঁর সেই বন্ধু আর কোন ডাক্তার নিয়ে আসেন। কিংবা অজয়বাবুর যদি জানা থাকে এঁর আর কোন বন্ধুর

কথা। অমনি একটু আমাদের বাড়িতেও খবরটা দিয়ে আসুন, আমার ফিরতে কাল সকাল হয়ে যাবে। পারেন তো আপনি কিছু খেয়ে নেবেন।'

তারপর একটু থেমে কুণ্ঠিত ভাবে বলে, 'শিয়ালদার মোড়ে এখনও ফল পাবেন, মুসাম্বী লেবু কিছু এনে রাখুন। এ টাকা আমি দু'টাকা এক টাকা ক'রে জমিয়ে রেখেছিলুম—থিয়েটারের উপার্জনের টাকা থেকে—এ বিমলবাবুর টাকা নয়। আপনার সন্ন্যাসী ভায়ের জন্যে খরচ করলে দোষ হবে না।'

'সন্ন্যাসীদের কিছুতেই দোষ হয় না ভাই, ওদের সংস্পর্শে অশুচিও শুচি হয়ে যায়। অবিশ্যি সত্যিকারের সন্ন্যাসী।'

অনুরোধটা ঘোর স্বার্থপরের মতোই। হীরুবাবুর সমস্ত দেহ ভেঙে আসছে এবার। সেটা না বোঝারও কথা নয় নীলার। কিন্তু তারও তখন বুঝলে চলে না।

অপরিসীম ক্লান্ত হীরুবাবুও নীলার মুখের দিকে চেয়ে না বলতে পারলেন না। বললেন, 'তা দে টাকা, তাই যাই। তবে ট্যাক্সিতেই ঘুরতে হবে ভাই, আমার আর এক পা-ও হাঁটার ক্ষমতা নেই, হাঁপানি রুগী, প্রাণটা কণ্ঠাগত হয়েছে। কপাটটা তুই দিয়ে বোস, তিনটে টোকা শুনলেই বুঝবি আমি এসেছি।'

সেই অন্ধকারের মধ্যেই হাৎড়ে হাৎড়ে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান তিনি।

হীরুবাবু চলে গেলে খালি চেয়ারটা নিয়েই একেবারে পাশে এসে বসল নীলা। একবার এমনিই—সন্তর্পণে গায়ে হাত দিয়ে দেখতে গিয়ে চমকে উঠল। জ্বর খুব বেড়েছে, গা পুড়ে যাচ্ছে। ইস, এটা যদি আগে দেখত—দাদাকে বললেই হ'ত, কোন ডাক্তার আসে কিনা একবার দেখতে। না হয় কিছু বেশী টাকা দিলেই হ'ত। হীরকের জামার পকেটেও নিশ্চয়ই কিছু টাকা আছে। এ সময় সঙ্কোচ করত না নীলা—দরকার হলে সেখান থেকেই নিত।

সে জানে বেশী জ্বরে জলপটি দেওয়া উচিত। কিন্তু দেবে কি ক'রে?

এদিক ওদিক চাইল, কোথাও কিছু নজরে পড়ল না। রুমাল আনা হয় নি, বাসে বসেই সেটা মনে পড়েছে। তাড়াহুড়োয় মাথাটা পর্যন্ত আঁচড়ায় নি একবার, মনও ছিল না সেদিকে অবশ্য—যেমন ছিল তেমনি চলে এসেছে। শুধু টাকাটার কথা ভোলে নি, পথেই দরকার হবে ভেবে মনে ক'রে রেখেছিল।

কিন্তু আর ইতস্ততঃ করার সময়ও নেই তখন।

নিজের শাড়িরই আঁচল একটু ছিঁড়ে নিয়ে পাট ক'রে পটি তৈরি করল, তারপর একটা ছোট বাটি যোগাড় ক'রে জল নিয়ে এসে টুলটার ওপর রেখে পটিটা ভিজিয়ে কপালে লাগিয়ে দিল। একটু হাওয়া করা দরকার। এত জ্বরের ওপর পাখা খুলতে সাহস হ'ল না, কতকগুলো খবরের কাগজ তাকে তোলা ছিল, তাই থেকেই একটা এনে মাথায় বাতাস করতে লাগল।

পটি লাগানোর সময় বুঝতে পারে নি। এখন হাওয়াটা লাগতে প্রায়-অস্ফুট কণ্ঠে একবার বলে উঠল, 'আঃ!'

তবে তার পর যেন অস্বস্তিটা আরও বাড়তে লাগল। ছটফট করতে চাইল, বোধ হয় শরীর খুব আনচান করছে তখন, অচৈতন্য অবস্থায় না পারছে সেটা প্রকাশ করতে, না পারছে পাশ ফিরতে—কেবল মাথাটাই চালতে লাগল ঘনঘন।

কে জানে হয়ত যন্ত্রণাও হচ্ছে খুব। প্রকাশ করতে পারছে না।

উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় নীলার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠল। কি করবে ভেবে না পেয়ে অকারণেই একবার জানলায় গিয়ে দাঁড়াল, হীরুবাবুর এত তাড়াতাড়ি ফেরার কোন সম্ভাবনা নেই জেনেও। অসুখের মধ্যে এমন আনচান করা গুরুতর বিপদের সঙ্কেত, অনেকের মুখেই শুনেছে সে। কিছু—কিছু খারাপ হবে না তো। মাগো!

শেষের শব্দটা আপনিই গলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হয়ত বা তাতেই একটু অর্ধচৈতন্য মতো হয়ে থাকবে। চোখ না খুলেই চুপিচুপি প্রায়-অস্ফুট কণ্ঠে হীরক বলে উঠল, 'জল, জল!'

'এই যে,' নীলাও প্রায় তেমনি ভাবে বলে।

তাড়াতাড়ি নিজেই ছুটে আসে সে জানলার কাছ থেকে—আঁচলটা দিয়ে গলা বুক ঢেকে আস্তে আস্তে মুখটা একটু ফাঁক ক'রে গ্লাসের জলটুকু মুখে ঢেলে দেয়। সবটাই একটু একটু ক'রে খেয়ে নেয়, তেমনি চোখ বুজেই—যেমন অসুস্থ লোক খায়। তবু সেটা যে সচেতন অবস্থায় নয়, তা স্পষ্টই বোঝা গেল। বেহুঁশ অবস্থাতেই দেহ তার অভ্যস্ত কাজ ক'রে গেছে, মস্তিষ্কের হুকুমের প্রয়োজন হয় নি।

জল খেয়ে সামান্য স্থির হয়ে ছিল, কিন্তু কিছু পরেই আবার 'উঃ!' ক'রে উঠে তেমনি ভাবে, চোখ বোজা অবস্থাতেই, স্বগতোক্তির মতো বলল, 'বড় কষ্ট! আর পারছি না!'

নীলা এবার সাহস ক'রে ওর গালে গলায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, গেঞ্জির মধ্যে দিয়ে বুকেও। ঘামে ভেজা ঠাণ্ডা হাত, শুধু হাতের তালুও তো নয়, ওপর হাতেরও অনেকখানি লাগছিল—বোধহয় এতখানি জ্বরের তাপের মধ্যে এই শীতল স্পর্শটুকুতে আরাম বোধ হয়েছে—আবারও আরামসূচক একটা শব্দ ক'রে উঠল, 'আঃ!' তারপরই জিভটা তেমনি ঠোঁটে বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'জল।'

গ্লাসে জল নেই, উঠে গিয়ে কুঁজো থেকে গড়িয়ে আনতে হ'ল। আবারও সেইভাবে আঁচল ঢাকা দিয়ে বাঁ হাতটা গলার নিচে দিয়ে মাথাটা একটু তুলে জল খাইয়ে দিল।

এবার কিন্তু জল খেতে খেতে বোধ হয় একটু হুঁশ এসে থাকবে, চোখটা খুলল একবার, চোখে চোখ পড়ল। কিন্তু তাতে কোন বিরক্তি বা বিস্ময় ফুটল না, বরং যেন একটা স্বস্তি, নির্ভরতার দৃষ্টিই ফুটল। বেশ সহজভাবেই—তবে তেমনি চুপিচুপি বলল, 'তুমি যাও নি?'

'না।' শুধু এই একটি অক্ষর ছাড়া আর কোন উত্তর দিতে পারল না নীলা। আর কোন কথাই বলার শক্তি নেই তার—ভয়ে লজ্জায় আবেগে গলা বুজে এসেছে। কেন কে জানে একটা কান্নাও ঠেলে উঠছে বুকের মধ্যে থেকে।

'যেও না।' বলে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার চোখ বুজল।

তারপর সেই চোখ বোজা অবস্থাতেই, একবার অতি অস্ফুট—তন্দ্রায়-শিথিল-হয়ে-আসা গলায় বলল, 'তোমার হাতটা ভারী ঠাণ্ডা।' তারপরই আবার যেন সেই রকম অচেতন হয়ে পড়ল।

হাতই বুলিয়ে দিচ্ছিল, এবার সাহস বেড়েছে, অভয় পেয়েছে খানিকটা, জলপটিটা পালটে দিয়ে নিজের মাথাটা আরও কাছে নামিয়ে এনে একদৃষ্টে দেখতে লাগল। দেখল গলার কাছটা ধ্বক্ ধ্বক্ করছে, ঠোঁটটাও কাঁপছে একটু একটু। যেন কি বলতে চাইছে, বাঁ হাতটাও তুলছে মধ্যে মধ্যে—কাউকে খোঁজার মতো ক'রে।

নীলা আরও একটু কাছে এল। আর ইতস্তত করবে না সে। সঙ্কীর্ণ বিছানারই একেবারে ধারে বসে আস্তে আস্তে ওর গালের ওপর নিজের গালটা রাখল, ঘামে ভিজে ঠাণ্ডা গাল ভাল লাগবে বলেই। এখন ওর জ্ঞান নেই, অন্ততঃ ঘৃণায় সরিয়ে দিতে পারবে না।

কিন্তু হীরকই এবার এক কাণ্ড ক'রে বসল। সেই অবস্থাতেই ওর দিকে পাশ ফিরে মুখটা সম্পূর্ণ নীলার গলার খাঁজে গুঁজে দিয়ে, জখম হাতখানা ওর গায়ের ওপর রেখে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

দীর্ঘ সময় সেই একভাবে কাটল।

কতক্ষণ তা বলতে পারবে না।

কোন কোন সময়ের হিসেব সাধারণ নিয়মে রাখা যায় না।

নীলার মনে হচ্ছে এই কাল অনন্ত কাল অবধি দীর্ঘায়ত হলেও আপত্তি নেই।

হীরুবাবু এসে গেলেন।

নিচে ট্যাক্সির শব্দ হতেই বুঝেছিল।

তখনই মনে পড়েছিল দোর খোলার কথা। কিন্তু এ অবস্থায় উঠতে গেলে যদি হীরকের ঘুম ভেঙে যায়!

সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল হীরুবাবু বলে গিয়েছিলেন বটে—কিন্তু

এদিকে এমনই তন্ময় হয়ে ছিল যে সে কথাটা মনে পড়ে নি, দোর খোলাই আছে।

হীরুবাবু তাঁর কথামতো তিনবার মৃদু টোকা দিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন একটু। তারপর কপাল ঠুকেই কপাটটা ঠেলেছিলেন। ঘরে ঢুকে অবশ্য অবস্থাটা বুঝতে এক নজরের বেশি লাগে নি। কোন প্রশ্ন কি শব্দও করেন নি আর। হাতে কিছু জিনিস ছিল, ফলই হবে—কাগজের ঠোঙার শব্দে সেটা বোঝা গেল—সেগুলো এক পাশে নামিয়ে রেখে মেঝেতেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বোধহয় এক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

ঘুম ভাঙল হীরকেরই প্রথম। আস্তে আস্তে চোখ খুলে এই একেবারে অপরিচিত অনভ্যস্ত অবস্থাটা বুঝতে—স্মৃতিকে ফিরিয়ে এনে—মিনিট দুই সময় লাগল। এটুকু বুঝল—নীলা এক বিঘতেরও কম জায়গাতে, নিশ্চয় খানিকটা ঝুলন্ত অবস্থাতেই কাঠের মতো স্থির হয়ে পড়ে আছে—অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য ক'রে—ওরই ঘুম ভেঙে যাবার ভয়ে। সে জেগেই আছে, নইলে পড়ে যেত এতক্ষণে।

হীরক যে জেগেছে তা টের পেল নীলা গলার কাছে চোখের পাতার ওঠা-নামা অনুভব করে। সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জায়, কটু তিরস্কার শোনার ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠতে গেল—কিন্তু পারল না, একটা কাঠের তক্তার মতোই সটান মেঝেতে পড়ে গেল।

হীরকও এবার উঠে বসল কোন রকমে, 'করলে কি, করলে কি! দূর পাগল। ঐ রকম এক ভাবে আছ এতক্ষণ, মাস্‌ল্‌ সব স্টিফ্‌ হয়ে গেছে, এখন কি হঠাৎ উঠতে পারো। আমিই উঠে তোমাকে ভাল ক'রে শুইয়ে দিতাম। ভয় হ'ল বুঝি যে উঠে আমি খুব রাগারাগি করব তুমি আমার গা ছুঁয়েছ বলে? আরে, এ কাণ্ড যে আমারই—তা কি আর বুঝতে পারি নি!'

এরই মধ্যে হীরুবাবু ঘুম ভেঙে উঠে এসেছেন। তাঁরও কষ্ট হয়েছে খুব—ঐভাবে বসে ঘুমোতে, কোমর তাঁরও তক্তা হয়ে উঠেছে, তবু বেঁকে-

চুরে কোনমতে উঠে এসে কাছে বসে নীলার হাত-পা, কোমর চুঁচে রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

নীলা লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না, তবু এটুকু সেবা না নিয়েও যে উপায় নেই।

এমন পড়ে থাকলে বলবে না। আরও লজ্জা পেতে হবে যদি সত্যিই হীরক তার সেবা করতে আসে।

হীরক একটুখানি ওর দিকে চেয়ে থেকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'নাও, এবার উঠে পড়ো। আশা করছি এবার আর পড়ে যাবে না। এখন অনেকটা সুস্থ বোধ হচ্ছে, হাতটায় যন্ত্রণা আছে, সে তো থাকবেই—জ্বরটা বোধহয় কমেছে। আমি বাথরুম থেকে মুখ হাত ধুয়ে আসি, তুমি এবার কি খেতে দেবে দাও। খুব ক্ষিদে পেয়েছে এখন।'

নীলা তাড়াতাড়ি উঠে এসে একটু ভয়ে ভয়েই প্রশ্ন করল, 'আমি ধরব? যদি পড়ে যান?'

হাসল হীরক, 'ধরবে? তা ধরো। যা কাণ্ড করেছি, তারপর না বলার আর অধিকার নেই। বাস্তবিক, তোমাদের খুব কষ্ট দিলুম। সব-চেয়ে হীরুবাবু বুড়ো মানুষ—কাল সারা দিনরাত কী পরিশ্রমই করলেন। তোমার জন্যেই করেছেন অবিশ্যি, তবু আমি নিজেকেও অপরাধী মনে করছি।'

নীলার হাত নয়, কাঁধে ভর দিয়েই বাথরুম পর্যন্ত গেল হীরক। বলল, 'ভেতরে ধরবার অনেক জিনিস আছে, পড়ব না, ভয় নেই—তুমি এখানেই দাঁড়াও।'

ফিরে এসে বিছানায় বসতে নীলা ছুটে গিয়ে নিজের মুখে চোখে জল দিয়ে এসে ফলগুলোও ধুয়ে নিয়ে একটা বড় প্লেটে কাটতে বসল।

তারপর বলল, 'রাত কিন্তু সাড়ে তিনটে, এখন পুজোটুজো কিছু করতে হবে না তো?'

হীরক হেসে বলল, 'আসনে বসে জল-ফুল নিয়ে আমি পুজো করি না। আমার একটু অন্যরকম।'

নীলা পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলল, 'দাদাকে কাল আরও কষ্ট দিয়েছি, আপনি জানেন না সে কথা—বেহুঁশ হয়ে ছিলেন। সত্যি এত অত্যাচার, হার্টটার্টের না গোলমাল হয়।'

'আবার কি করেছ? এই ছাখো, পাগলের কাণ্ড—'

উত্তর দিলেন হীরুবাবুই, বললেন, 'তোমার বন্ধু, তুমিই বলি—অজিতবাবু—অজয়বাবুর ভাইকে খবর দেবার ব্যবস্থা ক'রে এসেছি, সে খবর পৌঁছেও গেছে, ওঁরা সক্কাল বেলাই কোন ভাল ডাক্তার নিয়ে এখানে আসবেন। অবিশ্যি এই বুড়ি আমাকে টাকা দিয়ে পাঠিয়েছিল, ট্যাক্সি ক'রেই এসেছি গেছি—খুব একটা ধকল হয় নি।'

খানিকক্ষণ নীলার আনত মুখের দিকে চেয়ে থেকে সস্নেহ অনুযোগের সুরে হীরক বলল, 'কেন এত কাণ্ড করতে গেলে নীলা, না হয় আর ছুটো দিন তোমার সেবাই নিতুম। পারতে না সেবা করতে!'

টপটপ ক'রে নীলার ছুই চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ল। অনেকক্ষণ পরে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে যেন চুপি চুপি বলল, 'এ সৌভাগ্য যে আমার হবে—হতে পারে—এমন যে স্বপ্ন দেখতেও সাহস করি নি। ভেবেছিলুম আপনি হয়ত জ্ঞান হলেই তাড়িয়ে দেবেন। অথচ এইভাবে একা পড়ে থাকবেন, মনে করতেই আমার মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করছিল।'

হীরক চুপ ক'রে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে খানিকটা চেয়ে থেকে বলল, 'তা বটে। আমার যে পরিচয় পেয়েছ তাতে সাহস না হবারই কথা। আর তোমার বাড়িতেই বা কি বলত!'

নীলা এক প্লেট ভর্তি ফল এনে এবার টুলের ওপর রাখল।

হীরক বললে, 'আর ছুটো প্লেট নিয়ে এসো, আমরা তিনজনেই খাবো।'

নীলা কি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, হাত তুলে বাধা দিয়ে হীরক বলল, 'খেলে তিনজনেই খাবো, নইলে আমিও মুখে তুলব না এ থেকে। জানো তো আমার কড়া মেজাজ।'

হীরুবাবু মিটিমিটি হাসছিলেন, বললেন, 'দে ভাই, ছুটো থালাই

দে। ও পাগল নইলে খাবে না। অথচ ওরই খাওয়া দরকার। আর আমরা অতিথি--অতিথি সৎকারও তো করতে হবে কিছু দিয়ে। ভায়া তো ঘরে কিছুই রাখেন না দেখছি, একটা বিস্কুট কি এক চামচ চিনিও জুটবে না খোঁজ করলে।'

খেতে খেতে হীরক কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গিছল। খাওয়ার শেষে নীলার আনা জলে প্লেটের ওপরই হাতটা ধুয়ে ফেলে বলল, 'আপনাদের এ দয়া আমি কখনও ভুলব না হীরুবাবু, এ আমার বাকী সারা জীবন মনে থাকবে। আত্মীয় বলতে আমার কেউ নেই, আপনারা প্রায় জোর ক'রেই সেই জায়গাটা দখল করলেন। তবু আপনার কাছে ঋণী থাকব, কৃতজ্ঞ থাকব কিন্তু অপরাধী বোধ করব না।'

এই বলে একটু থেমে নীলার দিকে চেয়ে বলল, 'কিন্তু তোমার কাছে আমাকে অপরাধাই থাকতে হবে নীলা। তোমার দয়ার কথাও আমি ভুলব না,—মানুষের এমনই অহঙ্কার, মনে হচ্ছে তোমার কাছে আমার কিছু দাবিও আছে।'

নালার তুই চোখে জল ভরে আসে অকারণেই।

'সে তো আছেই। কেউ না জানুক, আমি জানি। আপনিই আমাকে মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন আবার।'

হীরক কি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে?

তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'তা জানি না। তবে তুমি বড় অপাত্রে দয়া করেছ নীলা, এর কোন প্রতিদানই দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাত আর বেশী নেই, এখনই ওরা হয়ত এসে পড়বে—হয়ত বাড়িতেই ধরে নিয়ে যাবে—আর হয়ত দেখাই হবে না কোনদিন। আমি বোধহয় তু-তিনদিনের মধ্যেই এখানকার পাট চুকিয়ে আমার গুরুদেবের কাছে চলে যাবো। সম্ভবতঃ আর লোকালয়ে ফিরব না।'

'সে কি!' চমকে উঠে নীলা, ব্যাকুলভাবে হীরকের মুখের দিকে চায়, দেখতে দেখতে তার মুখটা বিবর্ণ রক্তহীন হয়ে ওঠে।

হীরকও সেদিকে চেয়ে একটু যেন বিচলিত বোধ করে, তবু স্থির

কণ্ঠেই বলে, 'হ্যাঁ তাই। সেই জন্যেই তো অপরাধী কথাটা বললুম। তবে আমার জন্যে চিন্তা করো না। এ আমার সৌভাগ্য। আমার গুরু-দেবের কথা কাউকে বলি নি, কিন্তু কে জানে কেন আজ তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে।' তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, 'আমার গুরুদেব উচ্চ-কোটির সাধক একজন, আমার বিশ্বাস শুধু সিদ্ধ সাধক নন, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন তিনি। খুব বেশী লোক তাঁর এ শক্তি এ সিদ্ধির সংবাদ জানে না, কেন না তিনি দীর্ঘকাল সমস্ত জন-সমাজের বাইরে বাস করছেন।

'তবে যত উচ্চেই উঠুন, মানবদেহ নিলেই কিছু বাসনা থাকে। তাঁরও বাসনা হয়েছিল, তাঁর এ সাধনার রহস্য এর গভীর আনন্দর কথা আর একজনকে জানিয়ে যাবেন, উত্তরাধিকারী হিসেবে। যে আবার এ উত্তরাধিকার যোগ্য পাত্রে পৌঁছে দিতে পারবে। তাঁর এ বাসনা হৃদয়ে ওঠা মাত্র সে বার্তা তাঁর ইষ্টের কাছে পৌঁচেছে—স্বাভাবিক, কেন না আগেই বলেছি, তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন—তাঁর প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়েছে, এমনি, এই চেহারার একটি ব্রাহ্মণ সন্তান, দশ বৎসর বয়স, হরিদ্বারে এক খাবারের দোকানে চাকরের কাজ করছে। তার মধ্যেই সব লক্ষণ আছে—তুমি গিয়ে তাকে চিনে নিয়ে এসো, সে-ই তোমাব সাধনার উত্তরাধিকার বহন করতে পারবে।

'তখন সামনে কুম্ভমেলা, গুরুদেব বহুকাল পরে সে মেলায় এলেন। বর্ণনা মতো সে বালকটিকেও পাওয়া গেল, বাঙালী ব্রাহ্মণের ছেলে, উদ্বাস্তু বাবা-মা কাজের খোঁজে ঐখানে এসে পৌঁচেছিলেন, তাঁরা দু'জনে এক ধর্মশালায় কাজ পেয়েছিলেন—ছেলেটিকে দিয়েছিলেন ঐ খাবারের দোকানে। গুরুদেব আহ্বান করা মাত্র সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর সঙ্গে চলে গিয়েছিল, তার বাবা-মাও এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলার পর শান্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁদের ছেলে তাঁরা ঈশ্বরকে নিবেদন করলেন—এইতেই তাঁরা নিশ্চিন্ত, সুখী হয়েছিলেন। সন্ন্যাসীর আশ্চর্য প্রভাবে তাঁদের কিছু মাত্র উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দেখা দেয় নি, স্বাভাবিক

সন্তানস্নেহও সে উৎসর্গে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

'আমিই সেই ব্রাহ্মণ বালক।

'এর পর গুরুদেব আমাকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন হিমালয়ের এক দুর্গম জায়গায়, বরফে ঢাকা এক বিরাট পর্বত চূড়ার গুহায়। সেখানেই তিনি একা আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেখানে কোথা থেকে খাদ্য আসত, কোথা থেকে পশমের কাপড় পৌঁছত, তা আমি আজও জানি না। ওঁর সে সেব কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমার ছিল। আমি কোন অভাব বোধ করি নি।

'তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন—ঐহিক পারত্রিক সর্বরকমই। তাঁরই শক্তিতে আমি সমস্ত রকম শিক্ষা দ্রুত আয়ত্ত করতে পেরেছি। ব্রহ্মচর্যে দীক্ষার পর সেদিকেও কিছু কিছু শিক্ষা নিতে হয়েছে, কিছু সাধনা কিছু যোগ অভ্যাস করতে হয়েছে। শাস্ত্রগ্রন্থাদিও প্রচুর পড়িয়েছেন, এই সব প্রচলিত গ্রন্থ আর পরস্পর-বিরোধী মত থেকে কেমন ভাবে বিচার ক'রে সারবস্তুটুকু ছেঁকে নিতে হয় তাও শিখিয়েছেন; আবার সাধারণ ইতিহাস ভূগোল সংস্কৃত অঙ্ক ইংরেজী বাংলা তাও পড়িয়েছেন। কোথা থেকে এত বই সংগ্রহ করেছিলেন এ আমার কাছে আজও মহা বিস্ময়।

'সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা, লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটির পৃথিবীর অত উর্ধ্বে একা এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে দিবারাত্রি কাটানো, তাতেও কোনদিন বিরক্তি কি অবসাদ বোধ হয় নি, কি এক অসীম আনন্দে যেন দিনরাত ডুবে থাকতুম। আর কি দ্রুত এত রকমের পাঠ আয়ত্ত করেছি, কত অল্প সময়ে—সেও তোমরা ধারণা করতে পারবে না।

'এর পর আমার ঠিক কুড়ি বছর বয়স হতে আমি একদিন ওঁর কাছে সন্ন্যাস চাইলাম। উনি যেন ঘুম ভেঙে উঠে বললেন, "ঠিক তো, ওটা তো আমার খেয়াল হয় নি। আসলে তোর সাহচর্যে এত আনন্দে ছিলাম, এই বড় কর্তব্যটার কথাই ভুলে বসে আছি। কিন্তু শোন্, এর মধ্যে একটা কথা আছে,তার আগে তোকে আবার সংসারে ফিরে যেতে

হবে বাবা—কিছু দিনের জন্যে, লোকজন টাকা-কড়ি বিষয় প্রভাব প্রতিপত্তি এসবের মধ্যে বাস করার পর নিষ্কাম আর নিষ্কলুষ হয়ে যেদিন ফিরে আসবি—সেইদিন তোর হাতে সেই অমৃতের পাত্র তুলে দেব, যা এতদিন বহন করছি তোর জন্যে"।

'আমি তো অবাক্। মন খারাপ হয়ে গেল। উনি বললেন, "না রে টীকে নেওয়া থাকলে কলেরা বসন্ত হয় না আর, সে টীকে ঐ রোগের বিষ দিয়েই তৈরি। যেসব সন্ন্যাসী সংসারের স্বাদ পাবার আগেই এই জীবনে আসে তাদের বড় সহজে পদস্খলন হয়। পাকাঘুঁটি যাকে বলে তা না হতে পারলে বিপদ একটা থেকেই যায়। তোর ভয় নেই, সব ব্যবস্থা ঠিক থাকবে, আজ থেকে বারো বছর তুই সংসারে মানুষের মধ্যে বাস করবি, তারপর চিরদিনের মতো বিদায় নিয়ে চলে আসবি। আর যদি সেই স্বাদই ভাল লাগে—থেকে যাস, বুঝব আমার শিক্ষায় কোন ত্রুটি থেকে গিছল, যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু দিতে পারি নি, ঠিক মতো প্রস্তুত করতে পারি নি"।

'তাঁর কথার নড়চড় হবে না জানতুম। চলে এলাম তাঁর নির্দেশ মতো কলকাতায়। উনি বলেছিলেন, "এখানকার মাটিতে স্বর্গও আছে নরকও আছে। বড় বড় মহাপুরুষ তৈরি হয়েছেন এখানে, বড় বড় চিন্তাবীর, আদর্শবান মানুষ। আবার প্রলোভনের নানা উপকরণও ছড়ানো আছে চারিদিকে। এ কলকাতাকে অবহেলা করিস নি"।

'এখানে এসে কি ক'রে একটার পর একটা দ্রুত পাস করলাম, কি ক'রে গ্র্যাজুয়েট হলাম, এম. এ., আইন পাস করলাম, তারপর কি ক'রে এই চাকরি পেলাম—এও আমার কাছে রহস্যই থেকে যাবে। লোক যেন তৈরি ছিল, সঙ্গে ক'রে এখানে এনে এক পরিবারের মধ্যে রেখে গেল, টাকা কোথা থেকে এসেছে, বই খাতা, কলেজের মাইনে—কোন দিন জানতে পারি নি। ইস্কুলে পড়তে হয় নি, এসেই প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়েছি, পাসও করেছি—খাওয়া পরা, ভাল ভাল পোশাক পেয়েছি, কি ক'রে হয়েছে এসব কিছুই জানি না। খোঁজ ক'রেও

কোন সদুত্তর পাই নি। একেই তপস্যার প্রভাব বলে কিনা তাও বলতে পারব না। তার পরে এ চাকরিও—যেন আপনিই এসে গেল। বেছে বেছে এ চাকরি কেন, নিজেকে প্রশ্ন করেছি বৈকি, মনে হয় সংসার থেকে বিদায় নেবার আগে এর কিছু কিছু অতি ঘৃণ্য দিকও দেখে নিই—তাঁর এই ইচ্ছা।

'আমার সেই বারো বছর পূর্ণ হতে আর দুটো দিন বাকী। সেই-জন্যেই চাকরি ছেড়েছি, এখানের কাজও মোটামুটি শেষ ক'রে দিয়েছি, এই সামান্য দৈহিক আঘাতটুকু সাংসারিক জীবনের উপহার বলেই ধরে নিতে পারব। কিন্তু যাবার আগে তুমি আমার ওপর যে এই ঋণটুকু চাপালে নীলা, এ শোধ করার উপায় রইল না আর। শুধু তাই নয়—আমি স্বীকার করছি, আমিও তোমার সম্বন্ধে সামান্য একটু দুর্বল হয়ে পড়েছি। এও বোধহয় গুরুদেবেরই পরীক্ষা। শেষ, চরম পরীক্ষা। এখন তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি চলে যাই নীলা। তুমি যদি জোর করো, আমার যাওয়া কঠিন হবে। এখানের সব বন্ধন মুক্ত না হয়ে যেতে পারব না।'

অনেকক্ষণ সময় লাগল নীলার উত্তর দিতে। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে-ছিল এতক্ষণ হীরকের দিকে। এই অবিশ্বাস্য ইতিহাস শুনতে শুনতে দু'জন শ্রোতাই যেন পাথর হয়ে গিছল। এবার দুই চোখ আনত হ'ল নীলার, জলের ধারাও নামল। কিন্তু তার মধ্যেই সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'না, আমি আপনার সাধনায় বাধা দেব না, আমি জানি আমার কোন দাবি নেই, দাবি করার অধিকার নেই। আপনি চলে যান। তবে আমি কি একবার সে গুরুদেবকে দেখতে পাই না?'

'সে পথ বড় দুর্গম নীলা, বিশেষ তাঁর ইচ্ছা আর অনুমতি না হ'লে যাওয়া সম্ভব নয়।'

নীলা উঠে এসে হীরককে প্রণাম করল, অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে বলল, 'আপনি আপনার পথে স্বচ্ছন্দে চলে যান, কেবল আমাকে আশীর্বাদ ক'রে যান—আমিও যেন আপনার এই স্নেহ, এই দয়ার যোগ্য হতে পারি।'

উপসংহার

হীরক যখন এক বস্ত্রে একটি কম্বল মাত্র সার ক'রে আবার তার গুরুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তখন সে নিজেই সে বিষয়ে সচেতন—যে মুক্ত মন নিয়ে গিয়েছিল, সে মুক্ত মন নিয়ে ফিরে আসতে পারে নি।

সেদিন অজিতরা জোর ক'রেই ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ঠিক দু'দিনে ছুটিও পায় নি, ডাক্তার 'আর ড্রেস করবার দরকার হবে না' বলে ছাড় না দেওয়া পর্যন্ত ছাড়ে নি তারা। তারপর অবশ্য আর এক দিনও দেরি করে নি হীরক—কিন্তু এতেই তার পাঁচ-ছ'দিন বেশী হয়ে গিয়েছিল নির্দিষ্ট মেয়াদের।

এর মধ্যে সে নীলার সঙ্গে আর দেখা করে নি, নীলাও আসে নি। সে-ই মন্টুবাবু মারফত একদিন হারুবাবুকে ডাকিয়ে—তার এই কর্ম-জীবনের যা সামান্য উদ্বৃত্ত—হাজার তিনেক টাকা ওর হাতে দিয়ে বলেছিল, 'এটা নীলাকে দান করা বা উপহার দেওয়ার অধিকার আমার নেই। আপনিই রাখুন, ওর যদি কোন কাজে লাগে, উপার্জনে যদি না কুলোয়—টাকার দরকার হয়, তখন দেবেন—যেমন দরকার হবে।'

কিন্তু তবু, যত ইষ্টগতচিত্ত হবার চেষ্টা করেছে এই সারাটা পথ, গুরুকে ধ্যান করার চেষ্টা করেছে—ততই কি একটি আপাতঃ-পতিতা মেয়ের চোখের জল সে চিন্তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি? এই সামান্য একটু অপরাধী মনোভাব নিয়েই শেষ পর্যন্ত কি তাকে দাঁড়াতে হয় নি গুরুদেবের সামনে, সংসারের এই কলঙ্ক-টীকা কপালে নিয়ে?

গুরুদেব অনেকটা নিচে নেমে এসে অপেক্ষা করছিলেন ওর জন্যে—উত্তরকাশীর কিছু উত্তরে—দুই বাহু উন্মুক্ত ক'রে ওকে আলিঙ্গনও করলেন কিন্তু তাঁর মুখে সামান্য বিষাদের ছায়া হীরকের চোখ এড়াল না।

বিশ্রাম আর আহারাদির পর সেই প্রশ্নই সে করল, 'প্রভু, আমি কি পরীক্ষায় ব্যর্থ হলাম?'

গুরুদেব চমকে উঠলেন, বললেন, 'কে বললে ব্যর্থ হয়েছ? ব্যর্থ হয়েছি আমিই, আমার শিক্ষাতেই ভুল থেকে গেছে।'

বললেন 'তোমার নিষ্কাম ও নিষ্কলুষ চিত্তে ফিরে আসার কথা। নিষ্কলুষ তো ফিরেইছ, জাগতিক অর্থে নিষ্কামও ফিরতে পেরেছ। মেয়েটির প্রতি তোমার মনোভাব করুণার, স্নেহের—প্রেমের নয়, কামের তো নয়ই। তার মধ্যে তোমার মন সাংসারিক মাতৃস্নেহ, ভগ্নীস্নেহেরই আস্বাদ পেতে চেয়েছিল—যা পাও নি কোনদিন, যার ক্ষুধা মানুষের স্বাভাবিক। যেটুকু অন্য আকর্ষণ বোধ করেছ, সেটুকুতেও কোন দোষ হয় নি।'

হীরক আগে হ'লে চমকে উঠত, কিন্তু এই সর্বজ্ঞ সাধু সম্বন্ধে তার বিস্ময়ের কাল বহু দিন আগেই গত হয়েছে। সে শান্তভাবে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

গুরুদেবই বললেন আবার, 'সে মেয়েটি তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে, সে তোমাকে দেবতা, ইষ্টের মতো ভক্তি করে, অহরহ তোমার কথা চিন্তা করছে। তাকে ফেলে এলে কেন? বিবাহিত জীবনেও যে সন্ন্যাস পালন করা যায়, সাধনা করা যায়—সেইটেই বোধ হয় তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারি নি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ, তিনি বিবাহ করেছেন সাধন সঙ্গিনী হিসেবে—কিন্তু পুরাণোক্ত সাধুরা তো অনেকেই সন্তানের পিতা। তাঁদের যদি সাধনায় বিঘ্ন না হয়ে থাকে, তোমার হবে কেন?'

তারপর ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'সে মেয়েটি, আমি জানি, সন্ন্যাস নেবার জন্যে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন দুষ্ট লোকের হাতে পড়ে হয়ত আরও বিপন্ন হবে। আমি তাকে এখানে আনতে লোক পাঠিয়েছি, তোমাদের আমি বিবাহ দেব। সে মেয়ে শুদ্ধ প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, নিজের অসীম কষ্ট সত্ত্বেও তোমার পথে বাধা হয় নি। তাকে নিয়েই তুমি সাধনা করো।'

'তাহলে কি আমার সন্ন্যাস মিলবে না?' প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে হীরক।

'কে বললে মিলবে না।' গুরুদেব প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন, 'তোমরা উত্তরকাশীতে দশ বৎসর থাকবে, সে ব্যবস্থাও করেছি। জীবিকার অভাব হবে না, আদর্শ গার্হস্থ্যজীবন যাপন করো, এও এক মহান আদর্শ স্থাপন হবে মানুষের সামনে। সন্তান হয় তো হোক, তাদের ব্যবস্থা ক'রে ঐ দশ বৎসর পরে তোমরা স্বামী স্ত্রী আমার কাছে যাবে—সেই দিন তোমাদের হাতে আমার সমস্ত সাধনার ফল নিঃশেষে তুলে দিয়ে একেবারে ছুটি নেব। এই ক'বছর দেহটা রাখব শুধু সেই জন্যেই।'

সংযোজন

বিশোকার স্বামী তুহিনশুভ্র জার্মানী-ফেরত ইঞ্জিনীয়ার কিন্তু সেটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। পরিচালনা ভার, যাকে য়্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে, তাতে যেন তার জন্মগত অধিকার। কর্তা হয়েই জন্মেছে সে, ফলে—এ চাকরি ছেড়ে নিজে একটা কারখানা খুলতে যাচ্ছে শুনে, ব্যাঙ্ক বলতে গেলে যেচে সেধে অনেক টাকা ধার দিতে চাইছে সেজন্যে, জেনে—বর্তমান মালিকরা প্রায় অবিশ্বাস্য এক বেতনে চীফ ইঞ্জিনীয়ার ক'রে দিয়েছেন। এবং গঙ্গাতীরে সে পদের উপযুক্ত প্রাসাদোপম কোয়ার্টার, গাড়ি ইত্যাদি দিয়ে রেখেছেন।

তবু এটাও তার শক্তির সবটুকু নয়। তুহিন যথার্থ বিদ্বান। নিজের যান্ত্রিক-গ্রন্থ ছাড়াও বহু বিষয়েই তার পড়াশোনা এবং কোন কোন বিষয়ে রীতিমতো দখল আছে। সেজন্যে সে প্রতি মাসেই চার পাঁচশো টাকার বই আনায়।

বন্ধুরা বলে, 'তুহিনের যা কিছু উপার্জন সব বিলিতি বইওলারাই পায়।'

তুহিন তার জবাব দেয়, 'তবু তো এদেশেও তার খানিকটা থাকে।'

যখন আনায় তুহিন—এক সঙ্গে অনেকগুলো ক'রে আনায়। তাতে ডাক-খরচা, প্যাকিং-খরচা বেশ কিছুটা বাঁচে। বড় প্যাকেট হলে প্রায়ই রেলে কি রোডওয়েজে আসে, প্যাকিং মাশুল, এসব খরচ কম নয়। আবার সে রসিদ পাঠায় ডাকে, রেজেস্ট্রী ক'রে—সেও আজকাল অনেক পড়ে যায়।

প্যাকেট আসে সাধারণত দুপুরে। বিশোকাই খোলে। চটের প্যাকেট হলে চাকরকে দেয় খুলতে। সাধারণত সে প্যাকেট ওরা বাইরে থেকেই খুলে বইগুলো টেবিলে রেখে যায়। সেদিন বিশোকা ভিতরের বারান্দায় বসে কী একটা বুনছিল, রামলগণ ওর সামনেই ছুরি দিয়ে সেলাই কেটে চটটা খুলল। তারপর ভেতরের কাগজ-প্যাকিং

খোলার পালা।

অলস কৌতূহলে চেয়ে দেখছিল বিশোকা, কি দিয়ে কি ভাবে প্যাক করে ওরা—তাদের ভাষায় 'বইওলারা'। তা খুব যত্ন ক'রেই প্যাক করা হয়েছে দেখল। ওপরে একটা পীচ কাগজ, নিচে কেমন এক রকমের করগেট-টিনের মতো মোটা কাগজ, তার ঢেউ খেলানো অংশগুলো ফাঁপা—স্প্রিং-এর কাজ করে। তার পরে বই। কিন্তু না, আরও আছে; সব বই সমান মাপের নয় বলে সেই সব পাশের ফাঁকগুলো ভরাট ক'রে ধারগুলো সমান করতে বিস্তর কুঁচো-কাগজও দেওয়া হয়েছে।

কুঁচো বলতে অধিকাংশই ছেঁড়া চিঠি। প্রকাশকদের আপিসে যে-সব চিঠি আসে, সেই সবই ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। পুরনো অর্ডার, অভিযোগ, বিলম্বের কৈফিয়ত তলব। কিছু অবশ্য পুরনো প্রুফও আছে, যেখানে গোছা ক'রে কাগজ দেওয়া দরকার, মানে একটু বেশী অসাম্য—সেখানেই প্রুফের কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে।

হঠাৎই নজরে পড়ল এই সব ছেঁড়া চিঠির মধ্যে একখানা গোটা খাম। গোটা, মানে একদিক ছিঁড়ে পড়েছে কেউ, তবে একেবারে ছিঁড়ে ফেলে নি।

কর্মহীন অলস অবসর। বোনাটার এমন কোন প্রয়োজন নেই। অকারণ এতগুলি দাসী চাকরের কাছে চুপ ক'রে বসে থাকতে কেমন লজ্জা করে, তাই এটা হাতে নিয়ে বসা। এ অবস্থায় মন সামান্য একটু উত্তেজনা কি নতুনত্বের আভাস পেলেই সেটাকে অবলম্বন ক'রে সক্রিয় হয়ে উঠতে চায়। এক্ষেত্রেও কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠাটা স্বাভাবিক।

সে নিজেই উঠে এসে চিঠিটা তুলে নিল।

না, শুধু খাম নয়, খামের মধ্যের চিঠিটাও ছেঁড়া হয় নি।

আরও মজা, চিঠিটা বাংলাতেই লেখা।

যাঁর নামে চিঠি তিনিও বাঙালী, হয়ত বোম্বের এই ফার্মের ম্যানেজার হবেন, কিম্বা মালিকই, কে জানে। অশেষ রায় নাম, ঠিকানা ঐ প্রকাশকের আপিস। লিখেছেন জনৈক সত্যভূষণ সরকার, ঠিকানা কল-

কাতার ফরডাইস লেন। এমনি হয়ত চিঠিটা পড়ত না। পরের চিঠি পড়া ওর অভ্যেস নেই। কিন্তু হাতের লেখাটা ভাল বলেই চোখটা টানল। কৌতূহলও একটু হয় বৈকি, একজন আর একজনকে কি কথা জানাতে চায়—চিরন্তন কৌতূহল অপর মানুষের।

চিঠির আরম্ভটা নিতান্তই মামুলি ধরনের। একথা সেকথা—যেমন সাধারণ চিঠিতে লেখা থাকে। অনেক দিন ওদের খোঁজ পান নি সত্যবাবু; কেন নিজে নিতে পারেন নি তার নানান কৈফিয়ত; আজকাল কলেজে কত সমস্যা (বোঝা গেল ভদ্রলোক অধ্যাপক), ছাত্ররা কেউ পড়তে আসে না,—আসে আড্ডা দিতে, প্রেম করতে আর রাজনীতিক দলবাজী দাঙ্গাবাজী করতে; অধ্যাপকদের যে কোন ছুতোয় অপমান করতে পারলে আর কিছু চায় না; স্ট্রাইক তো লেগেই আছে, ইত্যাদি।

ইংরেজীতে যাকে বলে 'টকিং শপ'—তাই।

কিছু কিছু অবশ্য পারিবারিক কথাও আছে। কিন্তু আসল যা—যা একেবারেই আনকোরা, চমকে দেবার মতো বক্তব্য—সেটা আছে শেষের অনুচ্ছেদে।

পড়তে পড়তে সোজা হয়ে বসল বিশোকা।

সত্যবাবু লিখেছেন—

'হ্যাঁ, আর একটি বড় আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছে। আর কাহাকেও বলি নাই, কারণ এসব কথা শুনাইবার মতো তেমন লোক আমার বড় একটা কেহ নাই। তোমাকে আরও লিখি এই জন্য যে, তুমি জন্মান্তর, জাতি-স্মরতা প্রভৃতিতে বড় বিশ্বাস রাখো, চর্চাও করো।

'আমি গত সপ্তাহে পর পর দুই দিন স্বপ্ন দেখিয়াছি, আমার মা যেন —যেমন জপের মালা হাতে বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিতেন, তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া—বলিতেছেন, আমার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী নাকি জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, এজন্মে তাহার নাম হইয়াছে বিশোকা, এলাহাবাদের এক উকালের দুহিতা। ওখানকার জগত্তারণ কলেজে পড়িত, এখন বিবাহের পর কলিকাতার কাছে গঙ্গাতীরে কোন এক

স্থানে বাস করিতেছে।

'এই পর্যন্ত। স্বামীর নাম বা ঠিকানা বা সে কি কর্ম করে—তাহা মা কিছু বলেন নাই। আমিও যেন জিজ্ঞাসা করিলাম না। আশ্চর্য স্বপ্ন, না? সাধারণ স্বপ্ন হইলে মনে থাকিত না, এখানে একটু অসাধারণত্বের ব্যাপার আছে বলিয়াই মনে আছে। সাধারণ লোকে শুনিলে বলিবে আমি আমার স্ত্রীর কথা ভাবিতেছিলাম বলিয়াই স্বপ্ন দেখিয়াছি—কিন্তু ভাই, আমি বেশ চিন্তা করিয়া দেখিলাম—মার নাম করিয়াই বলিতেছি,—স্ত্রীর কথা সেদিন অর্থাৎ প্রথম দিন আদৌ ভাবি নাই। আজকাল বড় ভাবিও না। ভাবিলে লোকসান বৈ লাভ নাই। পুরাতন ক্ষতে বিস্মৃতির প্রলেপ পড়িয়াছে, এখন তাহা তুলিয়া পুনঃ দুঃস্মৃতির জ্বালায় জ্বলিয়া লাভ কি?...আরও একটা কথা, একই স্বপ্ন দুইবার দেখিলাম কেন? তোমার জাতিস্মরবাদীরা কি বলেন? দুই একজনকে বরং বলিয়া দেখিও।'

এ আবার কি কাণ্ড!

তার নামই তো বিশোকা। এলাহাবাদের মেয়ে—জগত্তারণেও পড়েছে এটা ঠিক। তার বাবা সুচেত চৌধুরীও ওকালতি করেন।

তবে কি সে-ই? তার কথাই লিখেছেন ভদ্রলোক? তাঁর মা-ও বলে গেছেন! বড় আশ্চর্য তো।

আরও আশ্চর্য—এই চিঠি এভাবে তার কাছেই এসে পড়ল! এ যেন দৈবেরই যোগাযোগ। বইয়ের প্যাকেটের মধ্যে চিঠি থাকে তা সে জানত না, থাকলেও এমন ভাবে গোটা চিঠি থাকবে কেন? আজই বা তার সামনে খুলবে কেন প্যাকেটটা। এ কী কাণ্ড!

এমন সে কখনও তো কল্পনাও করে নি।

শোনেওনি কখনো কারও কাছে।

নিজে না দেখলে, অপরে বললে অনায়াসে গাঁজাখুরী বলে ঠাট্টা করত!

কিন্তু যা হোক, একথাটা কাউকে না বলতে পারলে যে চলছে না!

অস্থির হয়ে স্বামীর লাঞ্চ খেতে না আসা পর্যন্ত ঘর-বার করতে লাগল বিশোকা। এমন ঘটনার কথা সেও নিশ্চয় কখনো শোনে নি, এমন যে ঘটে তাও জানে না।

কেন এমন ঘটল ? তবে কি যথার্থই জন্মান্তরবাদ সত্যি ? তাও যদি বা সত্যি হয়, ভদ্রলোক স্বপ্নে সে বার্তা পাবেন কেন।···

ওর স্বামী তুহিন এসে বারান্দায় পা দিতেই বিশোকা গিয়ে বলতে গেলে তার হাত ধরে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেল—একেবারে খাবার ঘরে।

এই সময়টা অবসর বেশী থাকে না, যদিও এক ঘণ্টা লাঞ্চএর সময় পায় সে, কারখানা থেকে বেরোতেই আধ ঘণ্টা পার হয়ে যায়। তাই আর পোশাক ছাড়ার হাঙ্গামা করে না, এসে হাত ধুয়ে একটা ন্যাপকিন নিয়ে টেবিলে বসে যায়।

আজ তাকে সেটুকু অবসরও দিল না বিশোকা। একেবারেই চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে চিঠিখানা হাতে দিল, 'পড়ে ছ্যাখো।'

তুহিন তো অবাক !

'এ কার চিঠি, এ তো কে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে লেখা দেখছি, আমিই বা পড়ব কেন ?···হাত-টাত ধুই—'

'সে জল এই তো গামলায় রেডী রেখেছি। তাতে যে সময় যেত সে সময়েই চিঠিটা পড়া হয়ে যাবে। না না, পুরোটা পড়তে হবে না, শেষের তিনটে প্যারা পড়ো।'

'বলি ব্যাপারটা কি ?'

'ব্যাপার গুরুতর। মশাইয়ের অর্ধাঙ্গিনী হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছেন, অন্য দাবীদার এসে গেছে !'

কিছুই বুঝল না তুহিন, তবে সত্যিই আর তখন সময় নেই, কতকটা হকচকিয়ে গিয়ে অগত্যাই চিঠি খুলে শেষাংশ পড়তে হ'ল। কিন্তু পড়তে পড়তে সেও একরকম সোজা হয়েই বসল। পর পর দুবার পড়ে চিঠিটা টেবিলে রেখে—বিলেতের অভ্যাস মতো, সাহেবদের অনুকরণে—একটা

'ফিউ—!' ধরনের শব্দ করল।

কিন্তু সে বিস্ময়টা সামলে ওঠার আগেই বিশোকা আর একটা বোমা ছোঁড়ে, 'হ্যাঁ গো, ভদ্রলোককে চিঠি দেব একটা।'

'চিঠি দেবে ? কাকে ? ঐ যে চিঠিটা লিখেছে ! হ্যাস।'

'কেন, দোষ কি ?'

'না, দোষ কিছু নেই, কিন্তু দরকারই বা কি !'

'বাঃ—কী বলছ।' স্বামীর প্লেটে মাছ তুলে দিতে গিয়ে থেমে যায় বিশোকা। উত্তেজনায় কথা আটকে যায় প্রায়, 'গত জন্মের স্বামীকে দেখব—এ কি কম সৌভাগ্য। এমন ভাগ্য কার হয় বলো দিকি !'

'ও, তুমি ঐ সব ননসেন্স বিশ্বাস ক'রে বসে রইলে! ঐ রিগ-ম্যারোল।'

তাচ্ছিল্যের সুরে বলে তুহিন।

তাচ্ছিল্য অবিশ্বাস বিদ্রূপ সব মিশে যায় তার গলার আওয়াজে।

'ননসেন্স কিসের !' এবার বিশোকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, 'তিনি আমাকে চেনেন না, আমার কাছে কিছু দাবীও করছেন না। চিঠি লিখছেন তাঁর বন্ধুকে—সে তো খামের নাম-ঠিকানাতেই বুঝছ। এরা কেউই আমাদের পরিচিত নয়। যোগ-সাজস ক'রে করছে তাও মনে করার কোন কারণ নেই। আমরা এদের বইয়ের অর্ডার দেব, সে বইয়ের প্যাকেটে এ চিঠি আসবে—তাও আমাদের নজরে পড়বে—এত হিসেব ক'রে জচ্চুরি করতে বসা কি সম্ভব ! অথচ দ্যাখো কেমন ঠিক ঠিক মিলে গেছে।'

'তা যে আত্মা এত বলেছেন তিনি তোমার ঠিকানাটা দিতে পারেন নি ?'

এটার ভাল উত্তর দিতে পারে না বিশোকা, সে দায় এড়িয়ে গিয়ে বলে, 'তা আসুনই না ভদ্রলোক, দোষ কি ? এখন আমি তাঁর প্রেমে পড়ে যাবো নতুন ক'রে—এই ভাবছ নাকি !'

আর সময় ছিল না তুহিনের। বলে, 'তা দাও। আসলে তোমারও

একটা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকা দরকার—অলস মস্তিষ্ক এই সব খোঁজে, কোথাও থেকে একটু মনটাকে ব্যস্ত রাখার খোরাক !'

সত্যি-সত্যিই সত্য সরকারকে চিঠি দেয় বিশোকা। নিজের পরিচয়, এলাহাবাদের ঠিকানা দিয়ে; কী করে তাঁর চিঠি ওর হাতে পড়ল তা জানিয়ে—কোন একদিন বিকেলের দিকে—যদি সুবিধে হয়—ওদের এই বাংলোতে আসবার আমন্ত্রণ জানায়।

উত্তরও আসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

সত্যবাবু যে অভিভূত হয়ে পড়েছেন—সে তাঁর চিঠির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ। এমন কাণ্ড তিনি তো কখনও দেখেনই নি, শোনেনও নি কারও মুখে। জন্মান্তর নিয়ে অবশ্য উনি তেমন মাথা ঘামান নি কখনও, তবে বিশ্বাস করতেন না বলেই ঘামান নি। এখন আবার নতুন ক'রে ভাবতে হবে। ইত্যাদি—

সব শেষে লিখেছেন— আগামী রবিবার বিকেলে তিনি আসবার চেষ্টা করবেন। শনিবার কলেজ থেকে ফোন ক'রে জানবার চেষ্টা করবেন, যদি রবিবার ওদের কোন অসুবিধা থাকে তিনি অন্যদিন আসতে পারবেন। তবে আগ্রহে কৌতূহলে এবং বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে মিশে তাঁর এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে কোন কাজে মন দিতে পারছেন না, বই পড়াতেও যেন রুচি নেই। অতএব সত্বর দেখা হলেই ভাল হয়।

সত্যবাবু রবিবার যথাসময়েই এলেন। বিশোকা তো দুপুর থেকেই ঘর-বার করছে—আর ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। গঙ্গার ধারের লনে চায়ের সাজ পড়েছে বেলা তিনটে থেকে। তুহিনের সেদিন গল্‌ফ্‌ খেলার কথা ছিল, বিশোকার জেদে তা হয় নি, সে মুখ-গোমড়া ক'রে বসে আছে। সেও ঘড়ি দেখছে, তবে সে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। গল্‌ফ্‌ খেলাটা তো হ'লই না, এখন যদি হুকুম সিংদের সঙ্গে অকশ্যন ব্রীজে বসা যায়—তবু এ বিকেলটার মানে হয়।

সত্যবাবুকে দেখে বিশোকা যেন একটু হতাশই হ'ল। অবশ্য ঠিক

যে কি দেখবে সে সম্বন্ধেও ওর কল্পনা বা আশা খুব স্পষ্ট ছিল না। বছর ষাটের এক ভদ্রলোক, সাধারণ চেহারা, পাঞ্জাবির ওপর খদ্দরের নেহেরু জ্যাকেট পরে এসেছেন। হাতে একটা পোর্টফোলিও ব্যাগ। চুল সব পাকা নয়, কিন্তু বিরল।

সত্যবাবু বরং বিশোকাকে দেখে একটু চমকে উঠলেন। তিনি কি তাঁর মৃতা স্ত্রীর চেহারাই আবার দেখতে পাবেন ভেবেছিলেন? যমজ বোনের মতো? তাঁরও সে বিষয়ের ধারণাটা খুব স্পষ্ট নয়। তবে সে যাই হোক—এমন সুশ্রী লাবণ্যবতী, প্রাণময়ী ছিপছিপে তরুণীকে দেখবেন তা ভাবেন নি। তেইশ চব্বিশের মতো বয়স হবে, উচ্চমধ্যবিত্তের ঘরণী হওয়া সত্ত্বেও কোথাও একটু মেদের লক্ষণ নেই, অথচ এখনকার কোন কোন মেয়ের মতো গাঁট-বার-করা দেহ নয়। রঙ উজ্জ্বল শ্যাম, তাতে ভারী একটি চমৎকার স্নিগ্ধতা।

তুহিন যতই বিরক্ত হয়ে থাক, বিলেত-ফেরত লোক, আচার-ব্যবহারে কোন অসৌজন্য প্রকাশ পেতে সে দেবে না। খুবই মিষ্ট হাসির সঙ্গে অভ্যর্থনা করল সত্যবাবুকে। হাসিমুখে বলল, 'আপনার সঙ্গে তো আমার কতকটা সতীনের সম্বন্ধ—তা কৈ আমি তো ঈর্ষা বোধ করছি না!'

'করবেন কি ক'রে—জেনারেশ্যন গ্যাপ কতকটা, নয় কি?' সত্যবাবু উত্তর দিলেন, 'সেই বয়সের চেহারাটা নিয়ে আসতে পারলে সে প্রশ্ন উঠত। এখন তো জানেনই আমি নিরাপদ, নখদন্তহীন।'

এই বলে তিনিও খুব হাসলেন।

তাঁর কিন্তু বেশী ভাল লাগল তুহিনকেই।

লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা, উজ্জ্বল-গৌর বর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী, হাসলে মনে হয় যেন জায়গাটা আলো হয়ে উঠল। কথাবার্তাও তেমনি মিষ্টি। আর সবচেয়ে যেটা ভাল লাগল, সে ওর পড়াশুনো। ইঞ্জিনীয়ার তা সে বিলেত-ফেরতই হোক আর জার্মানী-ফেরতই হোক—সাধারণ লেখাপড়ার ধার ধারে না বিশেষ, এ অভিজ্ঞতা বহু স্থানেই হয়েছে। তুহিনের সঙ্গে

কথা কয়ে—কী সূত্রে বিশোকা সত্যবাবুর খবর পেল সেই প্রসঙ্গে ও যে নিয়মিত বই কেনে জানতে পেরে—সত্যবাবু দু-চারটে প্রশ্ন করতে গেলেন। কিন্তু কথা পাড়তেই যেন পোড়খাওয়া হাঁড়ির মতো টং ক'রে বেজে উঠল।

সত্যবাবু অধ্যাপক এবং এখনকার মতো অর্থচিন্তাসর্বস্ব অধ্যাপক নন—পড়াশুনো ভালবাসেন; পড়াতেও। তিনিও এর এত বিষয়ে দখল ও আগ্রহ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। বিস্ময়—সেই সঙ্গে শ্রদ্ধাও। কীই বা বয়স ছোকরার—ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হবে না—এর মধ্যেই এত বই পড়ল কখন।

এদের জীবন দেখে যে ঈর্ষা হয় সে কথা অকপটেই স্বীকার করলেন সত্যবাবু।

ঈর্ষা হবারই কথা—তাতেও তো সন্দেহ নেই। রূপ, স্বাস্থ্য, সাফল্য। এই প্রাসাদোপম বাংলো, এতখানি বাগান, লন। সুন্দর সুন্দর আসবাব, সুদৃশ্য রুচিসম্মত পর্দা। দামী বেতের চেয়ার পেতে চায়ের ব্যবস্থা হয়েছে, উর্দিপরা বেয়ারারা খাবার চা সরবরাহ করছে মূল্যবান চিনামাটির বাসনে; দার্জিলিং চা। খাবার অবশ্য খুব একটা ভাল কিছু নয়—তবে সত্যবাবু জানেন, এটা স্বচ্ছলতারই অভিশাপ। চাকর বেয়ারাদের দিয়ে খাবার আনানো মানে তাদের রুচির ওপর বরাত দেওয়া। তাছাড়া তাদের দস্তুরীর প্রশ্নও আছে, তারা কখনই বড় দোকানে যাবে না। শুধু একটা ব্যাপারে আবারও চমকে উঠলেন সত্যবাবু। একটা পায়েসের প্লেট সামনে এগিয়ে দিয়ে বিশোকা বলল, 'এটা কিন্তু আমি নিজে করেছি সত্যবাবু, শুধু আপনারই জন্যে। এটা সব খেতে হবে, আর নিন্দেও করতে পারবেন না।'

চমকে ওঠার কারণ তার স্ত্রী হেমাঙ্গিনীও এই চিঁড়ের পায়েস করত—আর সে কতকটা এই রকমই।

একবার কি গা-টা শিরশির ক'রে উঠল তাঁর?

সত্যবাবু জোর ক'রে গঙ্গার দিকে চোখ ফেরালেন। অপূর্ব, সত্যি।

একেই তো জীবন বলে। এই গঙ্গাতীরে বাস করার শখ ওঁর বলতে গেলে আকৈশোর। কিন্তু সে আর হয়ে উঠল না। এসব শখ মেটার মতো সঞ্চয় তিনি কোনদিনই করতে পারেন নি, আর পারবেনও না। জীবন তো শেষ হয়েই এলো। বাবা বৌবাজারের এই বাড়িটুকু রেখে গিছলেন তাই। নিচের ঘরত্নটো ভাড়া দিয়ে—একটায় এক স্যাকরার কারখানা আর একটায় একজন স্থপুরি কাঠ এনে সন্দেশের তাড়ু বানায়—ওপরে নিজে বইপত্র নিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছেন একরকম ক'রে। কে জানে হয়ত হেমাঙ্গিনী বেঁচে থাকলে ছেলেপুলে হলে এইটুকু স্বাচ্ছন্দ্যেও থাকতে পারতেন না।···

ঘণ্টাখানেক পরেই উঠে পড়তে হ'ল সত্যবাবুকে। তুহিন উশখুশ করছে, হয়ত কোথাও যাবে। বিশোকারও 'কৌতূহল-অবসান' অবস্থা, অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে বার বার। এদের ভদ্রতা আর আতিথেয়তা-জ্ঞানের ওপর জুলুম করা উচিত নয়। সত্যবাবু, 'আচ্ছা তবে আসি ; বড় আনন্দ হ'ল। এ একটা রিভিলেশ্যনও বলতে পারেন, এর বৈজ্ঞানিক মূল্য অনেক।' বলে ব্যাগ ও ছাতি গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন একেবারে।

ওরাও সঙ্গে সঙ্গে এল, এদিকে রাস্তার দিকের বাগান পর্যন্ত। সামনেই একটা মাঝারি আকৃতির গাড়ি দাঁড়িয়ে। তুহিন হাতজোড় ক'রে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, আই মীন ধৃষ্টতা না ভাবেন—আমার গাড়ি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আস্থক। এখন বাস-এ ভীষণ ভীড় হবে, আপনার বাড়ি পৌঁছতে ত্নটি ঘণ্টা কেটে যাবে। কষ্টও হবে বিস্তর।'

সত্যবাবু ত্ন-চার বার প্রতিভদ্রতা হিসেবে, 'না না, কী দরকার মিছি-মিছি, আবার গাড়ি কেন—আমি তো বাসেই এসেছি' ইত্যাদি বলে শেষ পর্যন্ত গাড়িতে চড়েই বসলেন।

নতুন ঝকঝকে আরামপ্রদ যান, চলছে বলে মনেই হয় না। এর কাছে বাসে যাওয়া, ভীড় ঠেলে, কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে ঘামের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে!

ছোঃ।

সত্যবাবুর সমস্ত দেহ যেন এলিয়ে পড়ল।

সত্যবাবু সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারলেন না। মাথার মধ্যে এ যে কী একটা জ্বালা, তা তিনি বোঝাতে পারবেন না কাউকে, নিজেই বুঝতে পারছেন না।

ব্লাড প্রেসার বাড়ল হয়ত, সে তো বেড়েই আছে, গত পঁচিশ বছর ধরেই। ওষুধ খেয়ে কমাতে হয়—তবে তাতে তো ঠিক এরকমটা হয় না। তাঁর প্রেসার বাড়লে মাথা ঘোরে। এমন জ্বালা তো করে না।

সারারাত ছটফট ক'রে, বার বার মাথায় জল থাবড়ে ঘুমোবার চেষ্টা ক'রে ভোরে যখন উঠলেন তখন তাঁর উপলব্ধি হ'ল—এ জ্বালা ঠিক মাথার নয়—এ বুকের।

বাড়িতে কেউ থাকে না। ওপরতলায় তিনি একা। একটা ঝি একবেলা ঘর ঝাঁট দিয়ে বাসন মেজে চলে যায়। একটি লোক আছে ঠিকে—রান্না ক'রে দেয় একবেলা। বিকেলের খাবার ফ্রিজে রাখা থাকে। বিশেষ কোন দিনই তা খান না—এটা ওটা, ফল মিষ্টি এই খেয়ে শুয়ে পড়েন। যেদিন তৈরি খাবার খান নিজেই হীটার জ্বেলে (অবশ্য বিদ্যুৎ থাকলে) গরম ক'রে নেন। দু-তিন বার কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড রাখার চেষ্টা করেছেন—সকলেই বোতাম কলম ঘড়ি ইত্যাদি হাতিয়ে সরে পড়েছে। তাই এ ঠিকে ব্যবস্থা।

সারারাত জেগে এখন এক কাপ চা পেলে ভাল হ'ত। এটা তাঁকে নিজেকেই করতে হয়—আজও গ্যাস জ্বালিয়ে জল চড়ালেন কিন্তু মন এবং মাথা জ্বলল আরও বেশী। আজ তাঁর সংসার পূর্ণ থাকার কথা, স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে ভরাভর্তি ঘর। স্ত্রী থাকলে রাতদিনের লোক রাখার অসুবিধে ছিল না। স্ত্রী ভোরে উঠে চা ক'রে দিতে না পারুন—চাকর দিত। এমন ভাবে শূন্য ঘরে পড়ে থাকতে হ'ত না—সারারাত জেগে ক্লান্ত দেহে উঠে চা করতে হ'ত না নিজেকেই। এই দুর্দশা ও অসহায় অবস্থার

কথাটা ভাবতে ভাবতেই স্ত্রীর কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়া স্বাভাবিক।

পড়লও তাই। গরীব ঘরের মেয়ে হেমাঙ্গিনী, পরের দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে লেখাপড়া শিখছিল। চেহারাটা ভাল, লেখাপড়ায় মাথা আছে দেখেই বিয়ে করেছিলেন সত্যবাবু। এক পয়সা নেন নি, শ্বশুর ছিলেন, কিন্তু এক জোড়া বালা ছাড়া তিনি কিছু দিতে পারেন নি। গহনা সব সত্যবাবুই দিয়েছিলেন, অথবা বলা উচিত ওঁর মা ওঁর মা তখন বেঁচে, নিজের সব গহনা ভেঙে হার চুড়ি নেকলেস কানপাশা—গা-সাজানো গহনা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। বৌ দেখে খুশী হয়েছিলেন মা, ভাল চেহারা, অনার্সে বি. এ পাস করা বৌ—তাঁর একটা ছেলের বৌ যে বলবার বা দেখাবার মতো হ'ল, এই ভেবেই তাঁর খুশীর অন্ত ছিল না।

সত্যবাবু ভেবেছিলেন তিনি হেমাঙ্গিনীকে শব্দার্থেই উদ্ধার করলেন। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর মন ওঠে নি। কৃতজ্ঞতা বোধ করা তো দূরের কথা, তার মনে হয়েছিল সে ঠকে গেল। এ চালাক লোকটা যেচে সেধে না এলে, আর একটু অপেক্ষা করতে পারলে অনেক ভাল ঘর-বর পেত সে! বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা বা কল্পনা একটু উঁচু সুরেই বাঁধা ছিল। কে জানে এটা কেন হ'ল। ওর বাবা এই বাজারে দুশো টাকা মাইনের চাকরি করতেন—তার সঙ্গে কিছু কিছু অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করতেন, তাই কোন মতে মুখে অন্ন উঠত। পাশের বাড়ির এক দাদা (শেখর দা'র মতো—শরৎচন্দ্রের-বই-পড়া সত্যবাবু মনে মনে বলেন) পড়ার খরচ যোগাত, শাড়ি জামাও কিনে দিত আগে, এ নিয়ে তার নিজের বাড়িতেই 'কথা' উঠতে গোপনে নগদ টাকা দিতে শুরু করে। তবে তারও সাধ্য সীমিত, ভাল ভাল শাড়ি কেনার মতো টাকা দিতে পারত না।

তবে এই উচ্চাশা হ'ল কিসে?

গত পঁচিশ বছর ধরেই এ প্রশ্ন করেছেন সত্যবাবু—মনে মনে। কে জানে, হয়ত বান্ধবীদের বাড়ি গিয়ে তাদের অবস্থা দেখে; বা কলেজের যে সব অকর্মণ্য ধনীর ছেলেরা কানের কাছে গুঞ্জন ক'রে বেড়াত এবং

পার্ক স্ট্রীটের ভাল রেস্তোরায় গিয়ে খাওয়াত—তাদের কথাবার্তায় সচ্ছল জীবনের টুকরো টুকরো বর্ণনা শুনে বাকীটা মনের রঙ দিয়ে ভরিয়ে কল্পনায় একটা স্বপ্ন-চিত্র দেখে!

সত্যবাবু সম্বন্ধে তার অসন্তোষের কারণ বহুবিধ: এক—তিনি যথেষ্ট স্মার্ট নন। দুই—তিনি সুপুরুষ নন। তিন—তাঁর বয়স বেশী, যা বয়স তার চেয়েও বেশী দেখায়। চার—বইয়ের দিকে যতটা মনোযোগ তাঁর, বৌয়ের দিকে তার সিকিও নয়। পাঁচ—তাঁর গাড়ি নেই, ফোন নেই, ফ্রীজ নেই। ছয়—বাড়ি ফিরেই আগে মায়ের কাছে বসে আধ-ঘণ্টা কথা কয়ে তবে নিজের ঘরে অর্থাৎ স্ত্রীর কাছে আসে।

এর মধ্যে দুটো অসন্তোষের কারণ দূর করতে পেরেছিলেন সত্য-বাবু। বরং বলা উচিত, একটা আপনিই দূর হয়েছিল—মা হঠাৎ চার পাঁচ দিনের জ্বরে মারা গেলেন—আর একটা ফ্রীজ, তিনিই কিনে দিয়ে-ছিলেন কষ্টে সৃষ্টে।

মার মৃত্যুর পর অবশ্য হেমাঙ্গিনী কিছুটা মানিয়ে নিয়েছিল, তবে সন্তান ধারণে রাজী হয় নি কিছুতেই। বলেছিল—'না বাপু, দু-চারটে বছর একটু হেসে খেলে কাটাতে দাও। এখুনি অত তাড়া কিসের?'

হেমাঙ্গিনী আরাম ও বিলাসপ্রিয়, বাল্যকালে খাওয়া পরার দুঃখ পেয়ে মনে মনে একাগ্রভাবে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যই কামনা করেছে, সেই স্বপ্ন দেখেছে, এত স্বল্প আয়ের শিক্ষকের ঘরে তাই মন বসছে না—এই-টুকুই বুঝেছিলেন সত্যবাবু, স্ত্রীর যে একটু রোমান্টিক স্বভাব—সেটা লক্ষ্য করেন নি। ওরও অতৃপ্ত ক্ষুধা ছিল বৈকি। লুব্ধ মধুকরের দল গুঞ্জন করেছে আশেপাশে—কিন্তু নিজেদের দারিদ্র্য ও দীন পরি-বেশের জন্যে তাদের সঙ্গে সহজভাবে সমান ভাবে মিশতে পারে নি, তাদের সাগ্রহ উপহার নিতে সঙ্কোচ হয়েছে। ওর সহপাঠিনীরা স্কুল-জীবন থেকেই প্রেম চালিয়েছে—তাদের মুখে সত্য মিথ্যা বহু গল্প শুনেছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে মিথ্যা 'আষাঢ়ে' অবাস্তব অসম্ভব কাহিনীও সত্য বলে ভেবেছে, মনে মনে সেই জীবন কামনা করেছে,

কল্পনায় সেই আকৃতি লালন করেছে।

কলেজে থাকতে নিজের দৈন্য সত্ত্বেও হয়ত প্রেম আস্বাদন করতে পারত। কিন্তু এভাবে প্রেম হয় না—কোন মতে লুকিয়ে-চুরিয়ে জৈব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা যায় এক আধবার মাত্র—শুধু সেই সুযোগ নিয়ে নিজেকে এত হীন করতে, সহজ-প্রাপ্য করতে মন চায় নি বলেই করে নি।

অবশ্য এ সবই সত্যবাবুর অনুমান। তবে তিনি বহুদর্শী মানুষ, যে কলেজে পড়ান, সে কলেজে ছাত্রছাত্রী দুই-ই আছে, এছাড়া সপ্তাহে এক দিন বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াতে যান। সেখানে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বিস্তৃততর—দেখেছেন অনেক। তার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর উদ্গীরিত পূর্বস্মৃতির টুকরো-গুলো জুড়ে জুড়ে মধ্যের ফাঁকগুলি অভিজ্ঞতা ও অনুমান দিয়ে ভরিয়ে নিতে অসুবিধে হয় নি।

জানতেন, বুঝেছিলেন, তবু এ পরিণাম কল্পনা করতে পারেন নি।

মা জীবিত থাকতে অনেক বাধা-নিষেধ মানতে হ'ত। তাঁর মৃত্যুর পর অনেকটা স্বাধীনতা পেলেন—শুধু স্ত্রী নয়, স্বামীও। সত্যবাবুর একটি প্রিয় ছাত্র ছিল হায়দার বলে—ভক্তিমান ও মনোযোগী ছাত্র বলে সত্যবাবু তাকে একটু বেশীই ভালবাসতেন। সেটা ছিল উভয় পক্ষেই, 'রেসিপ্রোকাল' যাকে বলে ইংরেজীতে। সে ওঁর কলেজেরই ছাত্র, তার-পর এম. এ. পাস ক'রে রিসার্চ স্কলারশিপ নিয়ে ডক্টরেটও করেছে। এখন চেষ্টা করছে বাইরে যাবার—তবু এখনও সেই প্রথম জীবনের প্রীতি ভালবাসার সম্পর্ক আছে দুজনের। সত্যবাবু এখনও ওকে সেই তরুণ কিশোরের মতোই দেখেন, ধমক দেন, পিঠে হাত বুলিয়ে দেন, বৃষ্টিতে ভিজে এলে জামা ছাড়িয়ে নিজে হাতে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছিয়ে দেন। কিছু না খাওয়ালে তাঁর তৃপ্তি হয় না। হায়দারও হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে হিন্দুদের মতো।

মার মৃত্যুর পর হায়দারের এখানে আসার যখন কোন বাধা রইল

না, তখন সে প্রায়ই আসতে শুরু করল। সত্যবাবু যখন থাকেন তখন অবশ্য পড়াশুনোর কথা ছাড়া কোন কথা হয় না, তবে ইদানীং তাঁর কাজের চাপ অনেক বেড়েছে—পাঠ্যপুস্তকও লিখছেন কিছু কিছু। নিজে লেখেন, তা ছাড়াও অপরের লেখা সম্পাদনা করেন। প্রেসে বসে প্রুফ দেখে দিতে হয় অনেক সময়। হেমাঙ্গিনীকে সুখে রাখতে—তার ফ্রাজ রেডিও যোগাতে অনেক টাকার দরকার, সেজন্য ছুটির পর প্রায়ই দেরি হয় ফিরতে।

এই সময়টা হায়দার এসে পড়লে অপেক্ষা করে। চা খায়, গল্প করে হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে। লেখা পড়া জানা মেয়ে, কথা কইতে জানে, ঠাট্টা করলে বোঝে। হায়দার তখনও অকৃতদার। কারণ তার উচ্চাশা। ওদের ঘরের যে সব মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছে, তাদের দেখে যদি বা পছন্দ হয়, কথা কয়ে মন ভরে না। তাছাড়া সে ইংল্যাণ্ড কি জার্মানী কি পারীতে যাবে উচ্চতর শিক্ষার জন্য—সম্ভব হলে সেখানেই থেকে যাবে, এই তার গোপন অভিলাষ, এখনই তাই এসব অনভিপ্রেত বন্ধনে জড়াতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু মীনকেতনও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি হেমাঙ্গিনীকে দিয়ে শোধ তুললেন।

ঠিক কি ক'রে কি হয়েছে সবটা তো সত্যবাবুর জানা সম্ভব নয়—যেটা জানেন না সেটার জন্যেই তাঁর জ্বালা অনেক বেশী, কল্পনায় নানা-রকম প্রণয়-দৃশ্য দেখেন।—আঘাতটা তাই একেবারে অতর্কিতে এসে পড়ল।

হেমাঙ্গিনী একদিন এখান থেকে না বলে চলে গিয়ে মুসলমান হ'ল—অতঃপর হায়দারের সঙ্গে বিবাহে বাধা রইল না। পুরনো তারিখ দিয়ে একখানা চিঠি পরে ফেলা হ'ল সত্যবাবুকে মুসলমান ধর্ম নেবার আমন্ত্রণ জানিয়ে। এতে নাকি আইন বাঁচবে। অবশ্য সত্যবাবু যে এ নিয়ে নালিশ মোকদ্দমা করবেন না—তা হেমাঙ্গিনী যত না হোক—হায়দার ভালভাবেই জানত। তার চক্ষুলজ্জাও ছিল একটু। সে এর

মধ্যেই হায়দরাবাদে একটা আপাতত কাজ-চলার মতো চাকরি নিয়ে রেখেছিল, বিবাহের পরদিনই সেখানে চলে গেল।

সত্যবাবুর এই সংবাদটা পুরোপুরি জানতে দু'তিন দিন সময় লেগেছিল। তিনি এই প্রেম রহস্যের কিছুই জানতেন না, সন্দেহ মাত্র করেন নি, হায়দারকে ছোট ভাইয়ের মতো—হয়ত বা পুত্রের মতোই দেখতেন। আর হেমাঙ্গিনী ওঁকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখত তা জানলেও এমন কাণ্ড ক'রে বসবে তা কল্পনা করতে পারেন নি।

তাই প্রথমটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন বাড়ি খালি দেখে। ভাড়াটের কাছে চাবি রেখে গিছল হেমাঙ্গিনী। তখনও অত বোঝেন নি। গভীর রাত্রেও ফিরল না দেখে কী করবেন কোথায় খোঁজ করবেন ভাবছেন—হঠাৎ চোখে পড়ল আলমারির লকার খোলা, গহনাপত্রর একখানিও নেই। পরে দেখলেন মূল্যবান শাড়িগুলোও অন্তর্হিত।

এরপর আর কোথাও কোন চেনালোকের কাছে খবর নেওয়ার কি অর্থ আছে?

কে জানে। তখন বিস্ময় কেটে গেছে, কেমন একটা বিহ্বলতা দেখা দিয়েছে। কিছুই মাথায় যাচ্ছে না, কার্যও না কারণও না।

যখন সব সংবাদ পেলেন তখনও প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হ'ল তাঁর—সেটা হায়দারের জন্যে উদ্বেগ আর দুঃখ। অমন মেধাবী ছেলেটা, কত ওপরে উঠতে পারত—সাধ ক'রে এ কি সুকঠিন বেড়ি পায়ে পরল।

তারও পরে—প্রথম কিছুটা ক্ষোভ, দুঃখ এবং স্ত্রী সম্বন্ধে অনুযোগ মনে দেখা দিয়েছিল। আত্ম-করুণাই বেশী। এত ক'রেও ঐ সামান্য একটা মেয়েছেলের মন পেলেন না! কী চায় মেয়েরা আরও? গরীবের ঘরের মেয়ে আর কত ভাল পাত্রে পড়তে পারত?

আত্ম-অনুসন্ধানও কিছু কিছু করেছেন বৈকি। কী কী ত্রুটি ছিল তাঁর চরিত্রে, কিসের অভাবে যে হেমাঙ্গিনীর মন ভরল না?

তারপর কিন্তু অবস্থাটা থিতিয়ে গেল লোক লজ্জার যন্ত্রণা প্রশমিত

হলে যে মনোভাবটা বোধ করেছিলেন—সে হ'ল মুক্তির। অনেক ঝঞ্ঝাট অনেক দায়িত্ব—মন যোগাবার কঠিন পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলেন। এই বেশ আছেন তিনি। বিয়ে করতে যাওয়াটাই ভুল হয়ে গিছল।

তারপর—ক মাস পরে যখন খবর এল, সেদিন হামবুর্গের পথে প্লেন দুর্ঘটনায় যে একশো তিয়াত্তর জন মারা গেছে, তার মধ্যে ডঃ মহম্মদ হায়দার ও তাঁর স্ত্রী হামিদা বেগম ছিলেন—তখন হায়দারের জন্য দুঃখই বেশী বোধ করলেও হেমাঙ্গিনী সম্বন্ধে ক্ষোভটাও চলে গিয়ে একটু যেন বেদনাই বোধ করলেন। বেচারী! জীবনটা ভালভাবে ভোগ করার এত আকাঙ্ক্ষা, এত চেষ্টা—সেটাই ভোগ করা হ'ল না। জীবনেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ল, বলতে গেলে প্রারম্ভেই।

মনে হয়েছিল, সেদিন তিনি ক্ষমাই করতে পেরেছিলেন স্ত্রীকে।

কিন্তু এতকাল, এই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পরে আজ বুঝতে পারলেন যে ক্ষমা করা হয়ে ওঠে নি তাঁর।

বিশোকাকে দেখে—বরং বলা উচিত—বিশোকার এই সুখের জীবন দেখে তাঁর সেই প্রায়-শুষ্ক বা অজ্ঞাত ক্ষতটা যেন নতুন ক'রে দগ্‌দগিয়ে উঠল। সেদিনের সমস্ত বেদনা, জ্বালা, আপসোস—আজ আবার তার যন্ত্রণা নিয়ে উপস্থিত হ'ল। বরং সেদিন এতটা তীব্র হয়ে বোধহয় বাজে নি —আজ যতটা বাজছে।

কারণ আজ তার সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রচণ্ড দিকদাহকারী একটা ঈর্ষা। ওঁর জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে হেমাঙ্গিনী, নূতন দেহ নূতন যৌবন নিয়ে কেন এত সুখ, বিলাস, স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে, কেন অমন সুন্দর সুপুরুষ বিদ্বান কৃতী স্বামী পাবে! কেন! কেন! ভগবান তার স্বপ্নই সফল করলেন, ওঁর দুঃখটা বুঝলেন না।...

এই অবুঝ ছেলেমানুষী মনোভাব ভোলার চেষ্টা করেন বৈকি সত্যবাবু।

ছিঃ! এ কি সব ভাবছেন তিনি! তিনি যে মুক্তি পেয়েছেন, যে স্বাধীনতা—তার জন্যেই তো হেমাঙ্গিনীর কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। সে জন্মান্তরে সুখী হয়েছে, তার সাধ পূর্ণ হয়েছে—ওঁর স্বপ্ন, নীড় বাঁধার পরিকল্পনাও হয়ত জন্মান্তরেই সফল হবে।...

কিন্তু সব শুভবুদ্ধিই বুঝি এ পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী হয়। সত্যবাবু যতই মনকে বোঝাবার চেষ্টা করেন—ততই মনের মধ্যে সেই ছবিটা ভেসে ওঠে—সেই গঙ্গার ওপর বিস্তৃত লন, বিরাট বাংলো, অগণিত দাসদাসী, মূল্যবান আসবাব, সেই বহুমূল্য চীনামাটির বাসন, সুপুরুষ সুন্দর স্বামী; সেই অকারণে হাসি বিশোকার, মনের পাত্র উছলে উঠলে যে হাসি হাসতে পারে মেয়েরা সেই হাসি—ছেলেমানুষী আব্দারের ভঙ্গী, স্বামীর কাছে কথায় কথায় ঠোঁট ফুলনো; স্বামীর অখণ্ড মনোযোগ ও প্রেম—আর সমস্ত বুকটা যেন জ্বলে পুড়ে যায়, একটা যেন শারীরিক যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে বেড়ান।

এক একসময় থাকতে না পেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হন হন ক'রে হাঁটতে থাকেন অনির্দেশ্য ভাবে। কিন্তু আবারও বাড়ি ফিরতে হয়। আর বাড়ি ফেরা মাত্র নিজের একক নিঃসঙ্গ জীবন, আরামহীন, স্বাচ্ছন্দ্যহীন সামান্য জীবনযাত্রা যেন তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মতো এসে বেঁধে ওঁকে। বিষাক্ত তীরের মতোই জ্বালা এনে দেয় সর্বাঙ্গে।...

আট-দশ দিন এইভাবে জ্বলার পর একসময় অশুভবুদ্ধির কাছেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন বুঝি। এ কদিন খাওয়া দাওয়া হয় নি। রাঁধুনী-ঝিয়ের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেছেন, কলেজের সহকর্মীদের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে—তারা এই একান্ত অস্বাভাবিক ঘটনায় অবাক হয়ে বিশ্রামের উপদেশ দিয়েছে—শেষে নিজেরও সন্দেহ হয়েছে, পাগল হয়ে যাবেন নাকি! না কি গিয়েইছেন?

হঠাৎই একদিন শুনলেন বাদলের নামটা। আজকাল এই যে সব তথাকথিত রাজনৈতিক খুন হচ্ছে এর অধিকাংশই নাকি একটি লোকের কাজ। তার নাম বাদল। ভদ্রলোকের ছেলে, একটা কলেজেও নাম

লেখানো আছে—সে-ই প্রকাশ্যে গুণ্ডামি ক'রে বেড়ায়। কেউ বা কোন দল কিছু টাকা দিলেই—দল নির্বিশেষে—গিয়ে ছেলেদের খুন ক'রে আসে। এদিকে তার এমনই প্রতিভা—সবাই জানে এ কথাটা, তবু পুলিস পর্যন্ত তাকে সপ্রমাণ ধরতে পারে নি। মদ আর মেয়েমানুষের খরচ পেলে সে নাকি নিজের বাপকেও খুন ক'রে আসতে পারে অনায়াসে।

তিন চারদিনের প্রচ্ছন্ন অথচ অবিরাম চেষ্টায় বাদলের ঠিকানা বার করলেন সত্যবাবু। তারপর একদিন তাকে গিয়ে নিভৃতে ধরলেনও। অমুক মিল-এর অমুক লোককে খুন ক'রে আসতে পারবে? তিনি টাকা খরচ করবেন সে জন্যে।

বাদল প্রথমটা একটু সন্দেহ করেছিল। তারপর সেও খোঁজ খবর ক'রে, ওঁর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'পুরো দশটি হাজার দিতে হবে। পারবেন?'

একটু কাকুতি মিনতি করে, হাত জোড় ক'রে আট হাজারে রফা করলেন সত্যবাবু এবং ব্যাঙ্ক থেকে বলতে গেলে তাঁর যথাসর্বস্ব—পাঁচ হাজার টাকা তুলে এনে অগ্রিমস্বরূপ দিলেন। কথা রইল কাজ সারার পর বাকীটা দেবেন।

শীর্ণ ছিপছিপে গঠনের বাদল দত্ত মুখে একরকম কদর্য ভয়ঙ্কর ভঙ্গী করে বলল, 'এসব কাজ কেউ পুরো টাকা আগাম না পেলে করে না, তবে আমি করি। কেন জানেন তো? আমার সঙ্গে বেইমানী করলে আমি জ্যান্ত অবস্থায় তার নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে বার ক'রে তাকে দেখিয়ে দিই। একথা সবাই জানে।'

সত্যচরণ তাকে যথাসম্ভব অভয় দিয়ে নির্জন ঘরে এসে এরপর দুটো তিনটে দিন অবিরাম শুধু পায়চারি ক'রেই কাটালেন। খাবার দুবেলারই পাইখানায় ঢেলে দিতে হ'ল, এ অবস্থায় আহারে রুচি থাকা সম্ভব নয় বলে। বোতলে দুধ থাকে, খুব পিপাসা পেলে বা অপরিসীম ক্লান্তি বোধ হলে এক চুমুক ক'রে সেই কাঁচা দুধই খেতে লাগলেন শুধু।

তার পরের ঘটনাটা আপনারা সবাই জানেন, কাগজে পড়ে থাকবেন। "কে বা কাহারা অমুক মিল-এর চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারকে সন্ধ্যায় মিলের মধ্যেই হত্যা করিয়াছে। গাড়ি খারাপ ছিল বলিয়া নিহত ব্যক্তি সে-সময় একাই হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলেন—আততায়ী পিছন হইতে তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করে। পুলিসের সন্দেহ ইহা ইউনিয়নগত কলহের পরিণাম। এক শ্রমিককে বিগত সপ্তাহে গুরুতর অপরাধের জন্য বরখাস্ত করা হয়—পুলিস তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করিয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত আর কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।"

বাদল তার প্রতিশ্রুতি ঠিকমতো পালন করলেও বাকী তিন হাজার টাকা আদায় করতে পারে নি।

তার কারণ আরও একটি ছোট্ট সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে সে এতই ছোট হরপে ছাপা যে বিশেষ কারও নজরে পড়ে নি। শিরোনামা ছিল, "অধ্যাপকের শোচনীয় মৃত্যু।"

সত্যচরণ সরকার নামে জনৈক অধ্যাপক পূর্বদিন দ্বিপ্রহরে গঙ্গায় বান আসার সময় সহসাই বাবুঘাটের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ান—সে সময় জলের উচ্চতা ছিল সবচেয়ে বেশী। ফলে নিমেষে সেই প্রবল স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কেউ কেউ ভাবছেন এটা আত্মহত্যা। তবে তাঁর নাকি এমন আচম্বিতে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ানো অভ্যাস ছিল। অন্যমনস্কভাবেই নাকি এভাবে এসে দাঁড়াতেন তিনি!

—